# মাছি

জ্যঁ পল সার্ত্র

চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

# মাছি

জঁ্য পল সার্ত্র

শ্রেষ্ঠ ফরাসি নাটক-৫

অনুবাদ

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৭০

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ মে ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ
আশ্বিন ১৪২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং
৫৫/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত আশি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0069-1

উৎসর্গ

নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ছাত্র,
শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক জনতার উদ্দেশে

# ভূমিকা

পারী শহরের সীন নদীর তীর। এলাকাটির নাম স্যাঁ জারমেঁ। এখানে কাফেগুলিতে নিয়মিত আড্ডা বসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ শত্রুমুক্ত পারী আনন্দে উচ্ছল। এই কাফেগুলির একটিতে নিয়মিত আসেন জ্যঁ পল সার্ত্র। তাঁর সঙ্গে আসেন অনেক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক। সার্ত্র এদের সঙ্গে স্বভাবসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনায় তাঁর অস্তিত্ববাদের আলোচনা করেন। ইতিমধ্যে জর্মন-অধিকৃত পারীতে তাঁর প্রথম নাটক 'লে মুশ' (মাছি) অভিনীত হয়ে গেছে। অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে অচিরেই পারীতে অস্তিত্ববাদ হয়ে উঠল যুগের হাওয়া। দেখাদেখি পারীতে প্রতিষ্ঠিত হল অস্তিত্ববাদী কাফে, পানশালা আর নাইটক্লাব। পোশাকে অস্তিত্ববাদ, এমনকি চুলকাটায়ও অস্তিত্ববাদ। এককথায় সারা পারী তখন অস্তিত্ববাদের জোয়ারে অস্থির, চঞ্চল।

জ্যঁ পল সার্ত্র এ শতাব্দীর একটি বিস্ময়কর প্রতিভা। জীবদ্দশাতেই প্রায় কিংবদন্তির মর্যাদা লাভ করেছেন যে-কয়জন বিরল মনীষী, সার্ত্র তাদের অন্যতম। বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তাঁর প্রধানত অস্তিত্ববাদের একজন প্রবক্তা হিসেবে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকৃতিও, বিশেষত উপন্যাস এবং নাটকে, সমানভাবে স্বীকৃত। ১৯৬৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু সার্ত্র এ পুরস্কার গ্রহণ করেননি।

সার্ত্রের জন্ম পারীর একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবা ছিলেন নৌবাহিনীর অফিসার। সার্ত্রের বয়স যখন দু-বছর তখন তিনি ইন্দোচীনে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে তাঁকে মায়ের সঙ্গে লা রোশেলে এসে বসবাস করতে হয়।

এখানেই তাঁর স্কুলজীবনের শুরু। পরে পারীতে এসে চতুর্থ হেনরী লিসেতে ভর্তি হন। বাকালোরিয়া বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯২১ ও ১৯২২ সালে। ১৯২৪ সালে সার্ত্র ভর্তি হন পারীর বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একোল নরম্যাল সুপেরিয়রে। এখানেই তাঁর পরিচয় সিমোন দ্য বুভোয়ারের সঙ্গে। পরিচয় থেকে সখ্য, কিন্তু সে-সখ্য আমৃত্যু অটুট থাকলেও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হননি কখনো।

এ অনন্যসাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি নানাভাবে সার্ত্রের জীবন ও চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। এ্যালেন ও গুস্তাভ লঁসঁ-এর মতো পণ্ডিতজনের সাহচর্য তিনি লাভ করেছিলেন ওখানে। সহপাঠীদের যে-চক্রটির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন যুক্তিবাদী ও নাস্তিক। এরা সবাই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার কট্টর সমালোচক ছিলেন। বামঘেঁষা এ বন্ধুচক্রটির প্রভাব তাঁর জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। মাদাম দ্য বুভোয়ারের রচনা থেকে জানা যায়, সার্ত্র ছাত্রদের সৃজনশীল ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রবল উৎসাহী ছিলেন। গান লিখতেন, কবিতা লিখতেন এবং লিখতেন বুদ্ধিদীপ্ত বচন। এ সময়ই তিনি রচনা করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস, 'লা দেফেট' যা কিনা গালিমার প্রকাশনী প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচনা করেনি।

ছাত্রাবস্থাতেই সার্ত্রের দার্শনিক চিন্তাধারা ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধতে থাকে। 'লে নুভেল লিটারেইর' (নতুন সাহিত্যিক) নামে একটি প্রতিষ্ঠান যে-সমীক্ষা চালান তাতে সার্ত্র যে-বক্তব্য রাখেন তা থেকে এ-কথা স্পষ্ট যে একজন তরুণ ছাত্র হিশেবেই তিনি জীবনকে দেখতে শুরু করেন একটি অসংলগ্ন, সূত্রহীন, সঙ্গতিহীন, আকস্মিক অস্তিত্ব হিশেবে। এখানে প্রয়োজনের সূত্রে কিছুই গাঁথা নয়, তাই এর কোনো অন্তর্নিহিত ঐক্য নেই, নেই কোনো কাঠামো। এহেন অস্তিত্বের মাঝে মানুষ মুক্ত, বন্ধনহীন। মূল্যবোধ মানুষেরই তৈরি, অস্তিত্বের অংশ নয়। কিন্তু মানুষ আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয় তখনই যখন সে একদিকে নিজেকে মুক্ত বলে দাবি করে কিন্তু অন্যদিকে সন্ধান করে বেড়ায় জীবনের একটি সুবিন্যস্ত রূপকে।

একোল নরমাল থেকে সুকঠিন আগ্রেগাসিঁও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সার্ত্র ১৯২১ সালে। বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরি করতে হয় কিছুকাল। তারপর শিক্ষকতা। স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়েই তাঁর গভীরতর পরিচয় ঘটে কিছু যুগান্তকারী ঔপন্যাসিকের রচনার সঙ্গে। ডস পাসোস, ভার্জিনিয়া উলফ, ফকনার ও কাফকার রচনা তাকে বিপুলভাবে আলোড়িত করে। কিন্তু দার্শনিক সার্ত্রের জন্য অপেক্ষা করছিল এর চেয়েও এক বিস্ময়কর জগৎ। সহপাঠী রেমন্ড এ্যারঁ এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি ১৯৩৩-১৯৩৪ সালে একবছর বার্লিনের ফরাসি ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। এখানেই তাঁর সম্যক পরিচয় ঘটে হুসার্ল, হাইডাগার ও জাসপারের দর্শনের সঙ্গে। এঁরা তাঁর চিন্তার জগতে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকে উদ্দীপ্ত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত দর্শনের মূল চালিকাশক্তি ছিল ভাববাদ। বিমূর্তন সংজ্ঞা ও সারসত্তা এই ছিল ভাববাদী দর্শনের প্রধান অধীত বিষয়। চিন্তার এমন একটি পরিমণ্ডলেই অস্তিত্ববাদের বিদ্রোহ। অস্তিত্ববাদীরা বললেন ভাব নয়, সারসত্তা নয়—অস্তিত্বই সবকিছু। অস্তিত্বেরই রয়েছে পূর্বাধিকার। বিমূর্তন সারসত্তা নির্দেশ করে বটে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে না। সেজন্যই অস্তিত্বের কাছে এর অগ্রাধিকার কিংবা সে-অর্থে যে-কোনো সারসত্তারই, অগ্রাধিকার থাকতে পারে না।

সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদ এই সাধারণ ধারণাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব এবং জগতের অনিশ্চিত আকস্মিকতা। জগৎ ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত নয়। জাগতিক অস্তিত্ব অনিশ্চিত, আকস্মিক। এর কোনো পরম্পরা নেই, নেই যোগসূত্র। তাঁর উপন্যাস 'লা নসের' (১৯৩৮) নায়ক রকেত্যাঁর মধ্যে এই শূন্যতার, অস্তিত্বহীনতার উপলব্ধি এক অসহনীয় বিবমিষার জন্ম দেয়। জগৎ যোগসূত্রহীন, সম্পর্কহীন, প্রয়োজনহীন এক শূন্যতা—এ উপলব্ধি তাঁকে পাগল করে তোলে।

সার্ত্র ভৌতজগৎকে বিভাজন করেছেন দুটি ভাগে : জড়বস্তু যার কোনো চেতনা নেই এবং অন্যদিকে মানুষ যার চেতনা আছে।

প্রথমটিকে তিনি বলেন *অঁ-সোয়া* বা 'দি থিঙ ইন ইটসেলফ'। দ্বিতীয়টির নাম দিয়েছেন তিনি *পুর-সোয়া* বা 'দি থিঙ ফর ইটসেলফ'। জড়বস্তু অনড়, স্থবির, চেতনাহীন ফলে তার কোনো স্বাধীনতা নেই। কিন্তু মানুষ সচেতন, তাই সে তার চিন্তা অন্য বস্তুতে আরোপ করতে পারে। মূল্যবোধ তাই তারই সৃষ্টি। কোনো বস্তু যখন তার চেতনায় বর্তমান থাকে তখন তার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু তার চেতনায় না থাকলে তার জন্য সে-বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই। সে বস্তুর অবস্থান তখন একটা অস্তিত্বহীনতায়, একটা শূন্যতায়। সার্ত্র একেই বলেছেন *লো নেঁয়া* বা অস্তিত্বহীনতা। মানুষের চেতনার সীমাবদ্ধতাই তার চারপাশে সৃষ্টি করেছে এক সীমাহীন শূন্যতার। কিন্তু এ-শূন্যতা শুধু তার চারপাশেই নয়, রয়েছে তার নিজের মধ্যেও। কারণ ভৌত-অস্তিত্বের বিবেচনায় মানুষ হচ্ছে *অঁ-সোয়া* বা অচেতন অস্তিত্ব। তাই তাঁর নিজের মধ্যেই রয়েছে এক বিরাট অস্তিত্বহীনতা, একটি সীমাহীন শূন্যতা। কারণ চেতনা তাঁর ভৌত-অস্তিত্বের অতিসামান্যই সজ্ঞানে ধারণ করতে পারে।

অন্যদিকে মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একে অপরকে *অঁ-সোয়া* বা জড় বস্তুমাত্র ভাবতে পারে। অন্যকে স্বার্থপর আনন্দের সামগ্রী ভেবে তার স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে। তাই সার্ত্র মানবিক সম্পর্ককে দেখেন একটা দ্বন্দ্বরূপে। এ যেন এক অঘোষিত দ্বৈরথ। তাঁর 'উই ক্ল' (নো এক্সিট) নাটকটিতে চরিত্রগুলির মধ্যে যে-টেনশন, এ সেই দ্বন্দ্বেরই ফল। মানবিক প্রেমও এ-ধরনের একটি দ্বৈরথ—যেখানে মানুষ একে অপরের স্বাধীনতা খর্ব করতে চায়। কিন্তু প্রেম মাত্রই এমন নিদারুণ পরিণতির মুখোমুখি হবে এমন নয়। ব্যক্তিসত্তা ইচ্ছে করলে একটা প্রবল প্রয়াসে অন্যের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে পারে। সেটাই তার আত্মোপলব্ধি, তার স্বাধীনতা।

সুতরাং মানুষ এ পৃথিবীতে একা, স্বনির্ধারিত, স্বনির্বাচিত একরাশ দায়িত্বের মাঝে পরিত্যক্ত। তার সামনে এমন কোনো লক্ষ্য নেই যা তার নিজের নয়, এমন কোনো নিয়তি নেই যা সে নিজেই নিজের জন্য নির্ধারণ করে না। মানুষের অস্তিত্ব তাই একটা অনস্তিত্বের

শূন্যতায় ঘেরা। কিন্তু এ শূন্যতার সম্যক উপলব্ধিই তাঁর স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা কারো কাছ থেকে দান হিশেবে পাওয়া নয়। এ তার জাগ্রত হৃদয়ের স্বনির্ধারিত দায়িত্বের উপলব্ধি। সার্ত্রীয় নায়কেরা একটা প্রবল যন্ত্রণার শেষে এ উপলব্ধির আলোকেই স্নাত হন অবশেষে। স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বের এ শৃঙ্খল রয়েছে বলেই সার্ত্র মানবিক এ স্বাধীনতাকে দেখেন একটি দণ্ডাজ্ঞার মতো, যে-দণ্ডাজ্ঞা বাইরে থেকে আরোপিত নয়, তাঁর নিজেরই অন্তরের সুতীক্ষ্ণ সুকঠিন রায়। তাই তার সুস্পষ্ট উচ্চারণ : "I h'omme est condamne´ a etre libre" মানুষ তার স্বাধীনতায় দণ্ডিত।

'লে মুশ' (মাছি) নাটকটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন নাৎসী অধিকৃত পারীতে রচিত। ১৯৪৩ সালে জর্মন সেন্সরশিপের চোখে ধুলো দিয়ে নাটকটি পারীতে মঞ্চস্থ হয়। নাৎসী বন্দিশিবিরে একজন যুদ্ধবন্দি হিশেবেও সার্ত্র নাটক লিখেছেন, নিজেদের মধ্যে অভিনয় করেছেন। ১৯৪১ সালে মুক্তি পাবার পর অধিকৃত পারীতে প্রতিরোধ-আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে সার্ত্র একটি নাটক লেখার পরিকল্পনা করেন। সরাসরি নাৎসীবিরোধী প্রচারণা সম্ভব নয় বলেই তাকে এ নাটকে একটি যুৎসই অন্তরাল খুঁজতে হয়েছে। গ্রিক-পুরাণের আগামেমনন এবং অরেস্টিসের কাহিনীর অন্তরালে একদিকে যেমন প্রতিরোধ-আন্দোলনকে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত করেছেন, অন্যদিকে উপস্থাপন করেছেন তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনকে নায়ক অরেস্টিসের আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে। গ্রীক পুরাণের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই : ট্রয়ের যুদ্ধের শেষে বিজয়ী আগামেমনন দেশে ফিরে এসেছেন কাসান্দ্রাকে নিয়ে। স্বৈরিণী ক্লাইটেমনেস্ট্রা তার প্রণয়ী ইজিসথাসের সহায়তায় তাদের দুজনকেই হত্যা করল। আগামেমননের পুত্র অরেস্টিসকে গোপনে পাঠিয়ে দেওয়া হল অন্য রাজ্যে। কন্যা ইলেকট্রা এই দুঃসহ পরিবেশেই বড় হয়ে ওঠে। মনে মনে অপেক্ষা করে কখন অরেস্টিস বড় হয়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে। অবশেষে যুবক অরেস্টিস ফিরে আসে। নির্মমভাবে হত্যা করে মা এবং তাঁর প্রণয়ী ইজিসথাসকে। পরিণামে সে তাড়িত হয় ফিউরি বা প্রতিহিংসার দেবীদের দ্বারা।

সার্ত্র এ-কাহিনীকে মূল কাঠামো ঠিক রেখে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলোকে। তাঁর নাটকের শুরু অরেস্টিসের প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যটি দিয়ে। অরেস্টিস আরগোসে আসে, সঙ্গে তার অনুচর গৃহশিক্ষক। কিন্তু আরগোসের সব দরোজা আগন্তুকের জন্য বন্ধ। অরেস্টিস নিজদেশে পরবাসী। সারা আরগোস রাজার নির্দেশে তাঁদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ। এ দেশ থেকে আনন্দ নির্বাসিত, যৌবন পলাতক। আরোপিত এ শৃঙ্খলে মানুষ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ইলেকট্রা তাঁর ভাইয়ের প্রতীক্ষায় রয়েছে, মনে তাঁর প্রতিহিংসার আগুন। কিন্তু অরেস্টিস ফিরে এসেছে প্রতিহিংসার দ্বারা তাড়িত হয়ে নয়। তাঁর গৃহশিক্ষক তাকে শিখিয়েছেন নিজের স্বাধীনতাকে একমাত্র সত্য জ্ঞান করতে আর সবকিছুকে যুক্তির আলোকে বিচার করতে। কিন্তু আরগোসে এসে তাঁর মন ঠাঁই খুঁজে পায় না—একটা বিপুল নিকেতহীনতায় আক্রান্ত হয় সে। বৃথাই সে আপন প্রজাদের সঙ্গে একাত্ম হতে চায়। ধীরে ধীরে তার মনে একটি উপলব্ধির জন্ম হয়। হ্যাঁ, সে প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু সে প্রতিশোধ পিতৃহত্যার জন্য নয়। তাঁর জনগণের স্বাধীনতাকে হরণ করার জন্য। অনুশোচনা আর দুর্নীতির জুলুমশাহীকে উৎখাত করে—জনগণের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই সে প্রতিশোধ নেয়। অরেস্টিস তাঁর মা এবং ইজিসথাসকে হত্যা করে নির্মমভাবে।

কিন্তু ধর্মান্ধ, সংস্কারান্ধ জনতা তাঁকে গ্রহণ করল না। তারা তাঁকে ধাওয়া করে এবং অরেস্টিস দেবতার মন্দিরে আশ্রয় নেয় ইলেকট্রাকে নিয়ে। মাছিরূপী প্রতিহিংসারা তাঁকে ঘিরে ধরে। বাইরে অপেক্ষা করে ক্রুদ্ধ জনতা। ইলেকট্রার যেহেতু নেই কোনো আত্মোপলব্ধি সেহেতু সে অতীতের কারাগারে বন্দি। তাই অনুশোচনার নিরাপদ আশ্রয়কেই সে বেছে নেয়। কিন্তু অরেস্টিস অতীতকে অস্বীকার করে হত্যার সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়—এজন্য তাঁর কোনো অনুশোচনা নেই, এর জন্য সে নিজেকে দায়ীও মনে করে না, তাই দণ্ডভোগেরও প্রশ্ন ওঠে না। তাই সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে সে বলে : 'বিদায় হে দেশবাসী,

তোমাদের জীবনকে নতুনভাবে গড়বার চেষ্টা করো। এখানে সবই নতুন, সবই ওখানে শুরু হবে নতুন করে। আমার জন্যও এক নতুন জীবন শুরু হচ্ছে, এক আশ্চর্য বিস্ময়কর জীবন।'

নাটকটি নানা কারণে আমাদের পারিপার্শ্বিকতায় তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হবে বলে মনে করি। আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পাঠক যদি এ নাটকে নতুন জীবন শুরু করার অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাহলেই সার্ত্রের এ অনবদ্য সৃষ্টিটি আমাদের জীবনে অর্থবহ হয়ে উঠবে।

নাটকটি মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছি। আমার ফরাসি ভাষার জ্ঞান সামান্যই। কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালীন এ-নাটকটি আমার পড়তে হয়েছিল। আমাদের কলেজের ফরাসি অনুবাদ-কোর্সের খণ্ডকালীন শিক্ষিকা মাদমোয়াজেল অবেয়ার নাটকটির পঠনে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সে ঋণ আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আমার ফরাসি অনুবাদের সঙ্গে বন্ধুবর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের একটি যোগসূত্র অলক্ষ্যেই নির্মিত হয়ে গেছে। *তিনটি ফরাসী প্রবন্ধে* প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি যখন অনুবাদ করি—করেছিলাম সায়ীদ-সম্পাদিত ও বর্তমানে লুপ্ত *কণ্ঠস্বর*-এর জন্য। এ নাটকটি আমি অনুবাদ করেছি দীর্ঘকাল ধরে। ফেলে রেখেছিলাম স্বভাবজাত আলস্যে। একপর্যায়ে অনুজপ্রতিম রশীদ হায়দারের উৎসাহে বাংলা একাডেমীর *উত্তরাধিকার* পত্রিকায় সম্পূর্ণ নাটকটি প্রকাশিত হয়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নাটকটি পুস্তকাকারে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। এর ফলে আরেকবার প্রমাণিত হল যে আমার ফরাসি অনুবাদের সঙ্গে সায়ীদের একটি যোগসূত্র সত্যি রয়েছে।

**মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ**
ইংরেজী বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

# মাছি

## জ্যঁ পল সার্ত্র

| | |
|---|---|
| জীয়ুস | ক্লাইটেমনেস্ট্রা |
| অরেস্টিস | প্রথম প্রতিহিংসা |
| ইলেকট্রা | দ্বিতীয় প্রতিহিংসা |
| গৃহশিক্ষক | যুবতী |
| প্রথম সান্ত্রী | বৃদ্ধা |
| দ্বিতীয় সান্ত্রী | রাজপুরোহিত |

আরগোসের নাগরিকবৃন্দ

প্রতিহিংসার দেবীরা

পরিচারক ও

প্রাসাদরক্ষী দল

# প্রথম অঙ্ক

আরগোস শহরের একটি প্রশস্ত চত্বর। মাঝখানে মাছি এবং মৃতদের দেবতা জীয়ূসের মূর্তি। মূর্তিটির গালে রক্তের দাগ, চোখ শাদা।

## প্রথম দৃশ্য

মৃৎপাত্র হাতে কৃষ্ণবসনা বৃদ্ধা রমণীদের একটি শোভাযাত্রা এসে মূর্তির সামনে অর্ঘ্য দেয়। দৃশ্যপটের পেছনে একটি নির্বোধ বালক পা ছড়িয়ে বসে আছে। প্রথমে অরেস্টিস ও গৃহশিক্ষক এবং পরে জীয়ূসের প্রবেশ।

অরেস্টিস : এই যে শুনুন।

*বৃদ্ধা রমণীকুল আর্তনাদ করে ঘুরে দাঁড়ায়।*

গৃহশিক্ষক : দেখুন, যদি দয়া করে একটা কথা...[*রমণীকুল একযোগে মাটিতে থুতু ফেলে এক পা পিছিয়ে যায়*] আহা ভয়ের কী আছে! আমি শুধু ছোট্ট একটা খবর জানতে চাইছিলাম। আমরা পথিক। পথ হারিয়েছি [*মৃৎপাত্র মাটিতে ফেলে বৃদ্ধাকুলের ত্রস্তে পলায়ন*]। দুত্তোর ছাই। বুড়ি ধাড়ি...যত্তোসব! ভাবখানা এমন যেন কেউ মানহানি করতে যাচ্ছে...। [*শ্লেষের সুরে*] আহ্ কী মধুরই না হল এ প্রত্যাবর্তন প্রভু! এ শহরে আসার জন্য আপনার সে কী উদ্দীপনা, সে কী উৎসাহ। অথচ সারাটা গ্রিস আর ইটালিতে কিনা এমন হাজারো জনপদ ছড়িয়ে আছে—

আছে উত্তম পানীয়, অতিথির প্রতীক্ষায় উন্মুখ সরাইখানা, আছে প্রাণচঞ্চল রাজপথ। কিন্তু এই অসভ্য পাহাড়িগুলো—মনে হয় জীবনে কখনো বিদেশী দেখেনি কোনোদিন। কতবার যে পথের হদিস জানতে চাইলাম—অথচ একবারও যদি একটা সহজ উত্তর পেলাম। তার উপর এই অসহ্য গুমোট। এই আরগোস যেন এক দুঃস্বপ্নের শহর। চারিদিকে ভীতচকিত আর্তনাদ, চারিদিকে হৈহল্লা। দেখামাত্রই লোকগুলো এই ধু-ধু পথ বেয়ে কেমন গুবরেপোকার মতো আড়ালে পালায়। উহ্ অসহ্য এই জনহীন পথ, চকিত কম্পিত হাওয়া আর সূর্যের একই অশুভ দাবদাহ। এর চেয়ে মারাত্মক আর কী হতে পারে?

অরেস্টিস ॥ তবু এখানেই আমার জন্ম...

গৃহশিক্ষক ॥ সেরকমই তো শুনি। কিন্তু আমি হলে অমন ঘটা করে সে-কথা বলে বেড়াতাম না।

অরেস্টিস ॥ এখানেই আমার জন্ম, তবু আমাকেই এখানকার পথের ঠিকানা জেনে নিতে হয় আগন্তুকের মতো। যাক, ঐ দরজার কড়া নাড়ো দেখি।

গৃহশিক্ষক ॥ কিন্তু কী আশায়? কেউ এসে দুয়ার খুলবে এই তো! বাড়িগুলোর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন দেখি। বলুন দেখি কী মনে হয় আপনার? একটাও কি জানালা দেখছেন কোথাও? আমার তো মনে হয় জানালা ভেতরের আঙিনার দিকে মুখ করা, আর বাড়িগুলোর পেছন সব রাস্তার দিকে। [*অরেস্টিসের বিরক্তি লক্ষ্য করে*] আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ। তাই হোক। কড়া আমি নাড়ছি। কিন্তু কোনো আশা নেই সে আগেই বলে রাখছি।

[*গৃহশিক্ষক কড়া নাড়ে। কোনো সাড়া নেই। আবার নাড়ে। এবার দরজার পাট খানিকটা খোলে*]

নেপথ্য থেকে কেউ ॥ কী চান আপনি?

গৃহশিক্ষক ॥ ছোট্ট একটা কথা জানতে চাই। আপনি কি জানেন কোথায়... [*দরজা হঠাৎ সশব্দে তার মুখের উপর বন্ধ হয়ে যায়*] জাহান্নামে যা বেটা! যত্তোসব! তা প্রভু, হল তো, না আর কোথাও ঠুকে দেখব। বললে আমি এন্তারছে সব দরজার কড়াই নাড়তে পারি।

অরেস্টিস ॥ না, যথেষ্ট হয়েছে।

গৃহশিক্ষক ॥ আরে দাঁড়ান। এখানেও যে একজন রয়েছে দেখছি।...এই যে শুনছেন...

নির্বোধ বালক ॥ হাঃ!

গৃহশিক্ষক ॥ [*পুনরায় কুর্নিশের ভঙ্গিতে*] এই যে জনাব, শুনছেন।

নির্বোধ বালক ॥ হোঃ!

গৃহশিক্ষক ॥ হুজুর যদি মেহেরবানি করে ইজিসথাসের বাড়ির পথটা দেখিয়ে দিতেন!

নির্বোধ বালক ॥ হোঃ!

গৃহশিক্ষক ॥ আমি ইজিসথাসের কথা বলছি। আরগোসের রাজা ইজিসথাস!

নির্বোধ বালক ॥ হোঃ! হোঃ! হোঃ!

[*মঞ্চের পশ্চাতের অংশ দিয়ে জীয়ুসের নিষ্ক্রমণ*]

গৃহশিক্ষক ॥ না, কপালই মন্দ। তা না হলে সবেধন নীলমণি যে লোকটি দেখে পালাল না সেও কিনা পাগল! [*জীয়ুসের প্রত্যাবর্তন*] এ্যাঁ, আরে এ কী, লোকটি দেখছি এখানেও আমাদের পিছু নিয়েছে।

অরেস্টিস ॥ কে?

গৃহশিক্ষক ঃ ঐ দাড়িঅলা লোকটা!

অরেস্টিস ঃ ও, তোমার দেখার ভুল।

গৃহশিক্ষক ঃ সত্যি বলছি, আমি ওকেই যেতে দেখলাম।

অরেস্টিস ঃ হয়তো ভুল দেখেছ।

গৃহশিক্ষক ঃ অসম্ভব! ওরকম দাড়ি আমি জীবনে কখনো দেখিনি। অবশ্য পালার্মে জীয়ুসের ব্রঞ্জের মূর্তিতে ঠিক ওরকম দাড়ি ছাড়া। ওই দেখুন, লোকটা আবার আসছে। কী চায় ও আমাদের কাছে?

অরেস্টিস ঃ আমাদের মতো কোনো আগন্তুক হবে হয়তো-বা।

গৃহশিক্ষক ঃ কী যে বলেন! ডেলফির পথে প্রথম দেখা ওর সাথে। ইতিয়াতে জাহাজে চেপেও ওর দাড়ি আমার নজর এড়ায়নি। নোপ্লিয়াতে ও তো আমাদের পায়ে পায়ে ছিল বলতে গেলে। আর এখন ও বেটা এখানেও ঠিক ঠিক এসে হাজির। একে ঠিক দৈবযোগ বলা যায় না। [*হাত দিয়ে মুখ থেকে মাছি তাড়িয়ে*] যাই বলুন আরগোসের এই মাছিগুলো কিন্তু নগরবাসীদের চাইতে অনেক বেশি মিশুক।

ওই দেখুন, মাছির মেলা বসে গেছে ঐ হাবাটার চোখে। [*নির্বোধ ছেলেটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ*] নিদেন পক্ষে ডজনখানেক তো হবেই—মহাআনন্দে যেন একটুকরো রুটির উপর মচ্ছব বসিয়েছে। কিন্তু ওর মুখে কী নির্মল হাসি। যেন পরম তৃপ্তি মাছির এই চেটেপুটে খাওয়াতে। আর তা হবেই বা না কেন, ওর চোখ বেয়ে দেখুন-না কী সব বেরুচ্ছে, যেন জাত গোয়ালার দই আর কী! [*হাত দিয়ে গায়ের মাছি তাড়িয়ে*] যা, যা, বেটারা। এই যে, আপনার উপরও হামলা করতে ছাড়েনি দেখছি। [*মাছি তাড়াতে তাড়াতে*] আপনার কাছে

অবশ্য খুব খারাপ লাগার কথা নয়—নিজ দেশে নিজেকে পরবাসী ভেবে মনে যার এত খেদ, এত দুঃখ। তা অন্তত এই মাছিগুলো তো আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। দেখে মনে হয় যেন চিনতে পেরেছে। [*সবেগে মাছি তাড়িয়ে*] তা এখন একটু শান্তি দে বাবারা, জানি আমাদের খুব ভালো লেগেছে—কিন্তু এবার ক্ষান্ত দে, যথেষ্ট হয়েছে...। কোত্থেকে আসছে এই নচ্ছারগুলো? বড় কত দেখ না এক-একটা। আর গলার বাহার কী, যেন বাদলা দিনের কোলাব্যাঙের ঘাঙর গাঙ।

[*মুহূর্তের নীরবতা*]

গৃহশিক্ষক ॥ জনাবের পরিচয়?

জীয়ূস ॥ আমার নাম দিমিত্রিয়াস। এথেন্সে আমার নিবাস।

অরেস্টিস ॥ পক্ষকাল আগে জাহাজে আপনাকেই দেখেছিলাম বলে মনে হয়।

জীয়ূস ॥ জি, আমিও আপনাকে দেখেছিলাম বৈকি!

[*রাজপ্রাসাদ থেকে মর্মন্তুদ আর্তনাদ*]

গৃহশিক্ষক ॥ ওই শুনুন! আমার কিন্তু মোটেই এসব ভালো লাগছে না। তার চেয়ে, প্রভু চলুন পালাই এখান থেকে।

অরেস্টিস ॥ চুপ!

জীয়ূস ॥ ভয়ের কিছু নেই। আজকের দিনটিকে ওরা মৃতদের দিবস বলে। ওই চিৎকার দিয়েই সে-অনুষ্ঠানের শুরু।

অরেস্টিস ॥ এ শহরের অনেক খবরই আপনি রাখেন দেখছি!

জীয়ূস ॥ হ্যাঁ, প্রায়ই এখানে আসা পড়ে কিনা। ট্রয়ের যুদ্ধ শেষে আগামেমননের গৃহপ্রত্যাবর্তনের দিনও আমি এখানেই ছিলাম। বিজয়গর্বে স্ফীত গ্রিক নৌবহর এসে নোপ্লিয়ার বন্দরে ভিড়ল।

দুর্গপ্রাকারের উপর থেকে দেখা গেল হংসবলাকার মতো শাদা শাদা পালের মেলা সারাটা সাগর জুড়ে। [*মাছি তাড়াতে তাড়াতে*] তখন এসব মাছি ছিল না এখানে। আরগোস ছিল তখন ছোট্ট শহর—নীল আকাশের নিচে মদালসে অচঞ্চল। পরের দিন অন্যদের সাথে আমিও নগরপ্রাচীরের উপর উঠে রাজকীয় শোভাযাত্রা দেখলাম, সমতল ভূমিতে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে আসছে। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় রানী ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা দুর্গপ্রাকারে উঠে আসলেন। সঙ্গে বর্তমান রাজা ইজিস্‌থাস্‌। জনতা বিস্ফারিত নেত্রে তাদের মুখে দেখল অস্তমান সূর্যের ভয়াল লালিমা। তারা বুঝতে পেরেছিল এ কিসের অশুভ ইঙ্গিত। কিন্তু তবু কেউ কিছু বলল না। ইজিস্‌থাস্‌ ছিল রানীর প্রেমিক সে-কথা বোধহয় আপনি জানেন। নির্দয় পশু হলেও সেদিন তারও মুখে দেখেছিলাম খানিকটা ম্লান চিন্তার আভাস। কিন্তু....কী হল, আপনাকে অমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন!

অরেস্টিস ॥ ও কিছু নয়। দীর্ঘপথের ক্লান্তি আর তাছাড়া এই অসহ্য গরম! কিন্তু থামলেন কেন, আমার বেশ লাগছে শুনতে।

জীয়ূস ॥ আগামেমনন লোক হিশেবে ছিলেন চৌকস। কিন্তু একটা ভুল তিনি করেছিলেন। আইন করে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর সেটাই তার কাল হল। প্রকাশ্যে ফাঁসির দড়িতে কাউকে তড়পাতে দেখলে এই দেহাতি লোকগুলো দারুণ পুলক পায় আর তাতে তাদের এই পৈশাচিক বৃত্তিটাও আসে থিতিয়ে। কিন্তু বহুদিন এমন কিছু না-দেখে লোকগুলো সব

হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই ওরা কিসসু বলল না। মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল আবার একটা ভয়াল অপমৃত্যু দেখার পুলকে। রাজাকে ওরা বিজয়ীর বেশে নগরীর তোরণ অতিক্রম করতে দেখল। কিন্তু তবু ওরা কেউ কিছু বলল না। ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা যখন পালকের মতো নরম, পেলব বাহুদুটির সুরভি নিয়ে রাজাকে স্বাগত জানালেন, তখনও ওরা নীরব রইল। অথচ সে-মুহূর্তে ছোট্ট একটি কথা, শুধু একটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এগিয়ে এল না। মনে মনে সবাই তখন রাজার ঐ আঘাতে জর্জরিত বিকৃত মৃতদেহটার পৈশাচিক কল্পনায় মগ্ন।

অরেস্টিস ঃ কিন্তু আপনি কিছু বললেন না?

জীয়ূস ঃ জানি তা ভেবে আপনার রাগ হচ্ছে। হৃদয়বান বলে আপনাকে আমার আরো বেশি ভালো লাগছে। না, বলতে বাধা নেই, আমিও সেদিন নীরব ছিলাম। আমি প্রবাসী, আমার এখানে কিছুই বলার ছিল না। পরের দিন প্রাসাদের ভেতর থেকে যখন রাজার প্রাণভেদী আর্তনাদ শোনা গেল, তখনও তারা কিছুই বলল না। চক্ষে তাদের তখন উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস। সারাটা শহর তখন কামার্ত নারীর মতোই তপ্ত পুলকে শিহরিত।

অরেস্টিস ঃ আর তাই রাজদণ্ড এখন হন্তারকের হাতে। সুদীর্ঘ পনেরো বছর কেটেছে তার পরম সুখে। আমার ধারণা ছিল দেবতারা ন্যায়নিষ্ঠ!

জীয়ূস ঃ আ-হা-হা অমন চট করে দেবতাদের দোষারোপ করবেন না। এ-ধরনের অধর্মের মাঝে ধর্মের পথনির্দেশ, সেই ভালো নয় কি?

অরেস্টিস ঃ তা, কী পথনির্দেশ করলেন তারা?

জীয়ূস : পঙ্গপালের মতো মাছি পাঠালেন এ শহরে।

অরেস্টিস : মাছি! এখানে মাছির কী করার আছে?

জীয়ূস : ও মাছি, মাছি একটা প্রতীক বিশেষ। তবে দেবতারা এর প্রতিকার কী করলেন তা জানতে চাইলে নিজের চারপাশে ভালো করে একবার তাকিয়ে দেখুন। ওই ওখানে ঐ বুড়িটাকে দেখছেন কালো ছোট্ট দুটি কদর্য পা নিয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে উকুনের মতো গুটি গুটি চলছে—এই হল এ শহরের সেই কিম্ভূতকিমাকার জীবগুলোর নমুনা যারা প্রতিটি আনাচে-কানাচে কিলবিল করছে। আচ্ছা, বিশ্বাস নাহয় দেখুন আমি ওকে ধরে আনছি। [*ঝাঁপিয়ে পড়ে বুড়িটাকে টেনে মঞ্চের সামনে নিয়ে আসে*] এই যে দেখুন কেমন ধরেছি। এই মাগী শোন্, ইস্ ঢং দেখ না কেমন পিটপিট করে তাকাচ্ছে। বৈশাখের ঝলসানো রোদের আঁচ কি তোর ঐ চোখে আজ নতুন লাগছে নাকি? চেয়ে দেখুন, কেমন বড়শি-বেঁধা মাছের মতো তড়পাচ্ছে! এই মাগী, তোর আবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঐ কালো কাপড় কেন! কার জন্যে শোক করছিস, ক'ডজন ছেলে মরেছে তোর! বল্, কার জন্যে তোর কৃষ্ণবসন?

বৃদ্ধারমণী : শোক আমি কারো জন্য করছি না হুজুর। আরগোসের সবাই অমন কালো কাপড়ই পরে থাকে।

জীয়ূস : সবাই কালো কাপড় পরে? ও-হো, বুঝেছি। তোরা তোদের মৃত রাজার জন্য শোক করছিস।

বৃদ্ধারমণী : চুপ! দোহাই আপনার ও-কথা বলবেন না।

জীয়ূস : বুড়ি, তোর বয়েস তো অনেক দেখছি। হ্যাঁ, তুই নিশ্চয়ই শুনেছিলি সেই প্রাণভেদী আর্তনাদ—

সারাটা সকাল সে মর্মন্তুদ চিৎকার রাজধানীর পথে পাষাণে পাষাণে মাথা কুটে মরেছিল। তুই তার কী করেছিলি শুনি!

বৃদ্ধারমণী ॥ আমার সোয়ামী তখন মাঠে কাজে গেছে। আমি মেয়েমানুষ কিইবা আমার করার ছিল। ঘরের দুয়ার এঁটে চুপটি করে বসেছিলাম।

জীয়ূস ॥ হ্যাঁ, কান পেতে ছিলি আধখোলা জানালার পর্দার আড়ালে, যাতে ভালো শোনা যায় সেজন্যে। আর বুকের দুরুদুরু শব্দের সাথে তোর ঐ যৌবনের রসে স্ফীত নিতম্বে কি উদ্বেল হয়ে উঠেনি একটা অবরুদ্ধ পুলক শিহরণ?

বৃদ্ধারমণী ॥ চুপ করুন, দোহাই আপনার।

জীয়ূস ॥ আর সে-রাতে স্বামীর বুকে নিঃশেষে সঁপে দিয়ে পেয়েছিলি রমণের চরম পুলক, মধুচন্দ্রের মধুযামিনীর মতো।

বৃদ্ধারমণী ॥ হুজুর! আপনিও কি মৃতদের একজন।

জীয়ূস ॥ মৃত! আমি! পাগল নাকি! তা সে যাই হোক—আমি কে তা নিয়ে তোর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তুই বরং তোর নিজের কথা ভাব্। কৃত পাপের অনুশোচনা করে দেবতার দুয়ারে ক্ষমা চা।

বৃদ্ধারমণী ॥ অনুশোচনা! সেই আগুনেই তো জ্বলছি হুজুর। আহা কেমন করে বোঝাই সে-আগুন কেমন ধিকিধিকি জ্বলছে! সে-আগুনে শুধু আমি নই, জ্বলছে আমার মেয়ে—মেয়ের জামাই। ওরা প্রায়শ্চিত্তের জন্য বছরে একটা গরু বলি দেয়। আমার নাতিও জন্ম নিয়েছে এই চরম অনুশোচনার মাঝে। খুব ভালো ছেলে—অমন সোনার টুকরো ছেলে হয় না। কিন্তু পাপের বোঝার কথা ভেবে ভেবে ও যেন কেমন হয়ে

গেছে। হাসে না, খেলে না—অথচ ওর বয়স মাত্র সাত বচ্ছর।

জীয়ূস ঃ বেশ হয়েছে, তাই তো হওয়া উচিত। আর ঐ আগুন বুকে নিয়েই মর্ গে। ঐ তোর মুক্তির একমাত্র পথ। যা, ভাগ এখান থেকে। [*বৃদ্ধারমণীর পলায়ন*] জানেন, আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু—আমার মনে হয় অতীতের ধর্মবোধ শঙ্কার মাঝেই নিহিত।

অরেস্টিস ঃ আপনি কেমনধারা মানুষ শুনি!

জীয়ূস ঃ আমার ভালোমন্দে কার কী আসে যায়। আমরা আলোচনা করছি দেবতাদের সম্পর্কে। আপনিই বলুন, ইজিসথাসের চরম শাস্তি দেওয়া কি উচিত ছিল না তাদের?

অরেস্টিস ঃ উচিত ছিল...তা আমি কী করে বলব কী তাদের উচিত ছিল? আর ও নিয়ে আমিই-বা মাথা ঘামাতে যাব কেন। আমি এখানকার কিছুই জানি না। ইজিসথাসও কি এমনি অনুতপ্ত?

জীয়ূস ঃ ইজিসথাস! খুবই অবাক হব তাহলে। আর সে অনুতপ্ত হলেই-বা কী আসে যায়। সারাটা শহর তারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে—অন্তহীন বিরামহীন সে-অনুশোচনা। [*রাজপ্রাসাদের ভেতর থেকে ভয়াবহ ভৌতিক চিৎকার ওঠে*] ওই শুনুন। মৃত রাজার মরণ-চিৎকার যাতে না ভোলে সেজন্যে ওরা মৃত্যু উৎসব পালন করে প্রতিবছর এই দিনটিতে। পাহাড়ি এলাকা থেকে উচ্চতম কণ্ঠের অধিকারী কোনো মেষপালককে ধরে আনা হয়, আর প্রাসাদের বৃহত্তম কক্ষে তাকে রাখা হয় এ-ধরনের আর্তনাদ করার জন্য। [*অরেস্টিসের মুখে ঘৃণার অভিব্যক্তি*] আরে আপনি দেখছি এর

মধ্যে ঘাবড়ে গেলেন! এ তো নস্যি-মাত্র, ওরা যখন মৃতদের মুক্ত করে দেবে তখন আপনি কী বলবেন তাই আমি ভাবছি। ঠিক পনেরো বছর আগে এই দিনটিতে আগামেমননকে হত্যা করা হয়েছিল। আর সেইদিন থেকে আরগোসের এই প্রাণচঞ্চল লোকগুলোর জীবনে কী অভাবনীয় পরিবর্তনই না এসেছে। এখন ওরা আমার কত আপন, কত অন্তরঙ্গ!

অরেস্টিস ॥ অন্তরঙ্গ! আপনার!

জীয়ূস ॥ ধীরে যুবক, ধীরে। সামান্য ভুল হল। আমি বলতে চেয়েছিলাম দেবতাদের অন্তরঙ্গ।

অরেস্টিস ॥ অবাক করলেন আপনি। আপনি কি বলতে চান যে এই রক্তাক্ত দেয়াল, মাছির ঝাঁক, ধু-ধু রোদ্দুর, এই জনশূন্য পথ, ঐ রক্তাপ্লুত দেবতার মুখ আর ঐ অন্ধকার ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে চলা লোকগুলোর ছাতি পেটানো মাতম, ঐ রক্তহিম করা ভয়াবহ চিৎকার—আপনি কি বলতে চান জীয়ূস ও অন্যান্য দেবতারা এতে আনন্দ পান!

জীয়ূস ॥ দেবতাদের বিচার করতে যাওয়া ঠিক নয় যুবক। তাদের কিছু গোপন দুঃখ আছে বৈকি!

*[নীরবতা]*

অরেস্টিস ॥ ইলেকট্রা নামে আগামেমননের একটি মেয়ে ছিল বোধ করি!

জীয়ূস ॥ হ্যাঁ, সে এখানেই আছে। অরেস্টিস নামে তার একটি ছেলেও ছিল শুনেছি। শুনেছি সে মারা গেছে।

অরেস্টিস ॥ হ্যাঁ প্রভু, আপনি তো ভালো করেই জানেন সে মরে গেছে। নোপ্লিয়ার লোকের মুখে শুনেছি

আগামেমননের হত্যার পরেই ইজিসথাস তাকে সাবাড় করার আদেশ দিয়েছিলেন।

জীয়ূস ঃ তবু কেউ কেউ বলে সে নাকি বেঁচে আছে। যে লোকের হাতে শিশু অরেস্টিসকে হত্যার ভার দেয়া হয়েছিল সে নাকি দয়াপরবশ হয়ে তাকে বনে রেখে আসে। এথেন্সের কোনো ধনাঢ্য তাকে পেয়ে বাড়ি নিয়ে যান। কিন্তু আমার মনে হয় তার মরাই ভালো ছিল।

অরেস্টিস ঃ কেন, কেন বলুন দেখি!

জীয়ূস ঃ এই ধরুন সে যদি কোনোদিন এ শহরে এসে হাজির হয়—তাহলে...

অরেস্টিস ঃ থামলেন কেন, বলুন।

জীয়ূস ঃ তা আপনি যখন একান্তই শুনতে চাইছেন। তার সঙ্গে দেখা হলে আমি বলতাম—দেখ বালক—বালকই বলতাম, কারণ ওর বয়স হয়তো আপনার মতোই হবে—মানে বেঁচে থাকলে আর কী। ভালো কথা, আপনার নামটাই যে জানা হয়নি এখনও।

অরেস্টিস ঃ ফিলেবুস। করিন্থে আমার পিতৃনিবাস। কিছুদিন হল দেশভ্রমণে বেরিয়েছি মনটাকে খানিকটা সজীব সতেজ করার জন্যে। আর আমার সাথে এই বুড়ো ক্রীতদাস আমার গৃহশিক্ষক।

জীয়ূস ঃ ধন্যবাদ! যাক আমি অরেস্টিসকে এই বলতাম—দেখ বালক, সুবোধ ছেলেটির মতো মানে মানে কেটে পড়ো। কী করতে এসেছ এখানে। আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে? হ্যাঁ, মানি তুমি সাহসী। আমিও শক্তির অধিকারী। একদল ভালো যোদ্ধার পুরোভাগে সুদক্ষ দলপতি হওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে। কিন্তু এই জীবিত-অথচ-মৃত, পূতিগন্ধময় মাছিসংকুল শহরের উপর প্রভুত্ব করার

চাইতে মহত্তর অনেক কিছুই করার তোমার রয়েছে। এ-শহরের বাসিন্দারা মহাপাপী—আর এরা-যে অনুশোচনায় জ্বলছে সে তো দেখতেই পাচ্ছ। এদের এভাবেই থাকতে দাও—ওদের এই প্রাণান্তকর প্রয়াসকে সম্মান করো। তুমি তো আর ওদের দলে নও। তোমার ঐ নিষ্পাপ পবিত্রতা তোমার আর ওদের মাঝে তুলে দিয়েছে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল। সুতরাং ওদের জন্য বিন্দুমাত্র দরদ থাকলে চলে যাও। চলে যাও, না হলে ওদের ধ্বংস তোমার হাতেই। মুহূর্তের জন্যও যদি বাধা দাও তাহলে ওদের এই পাপ ঠাণ্ডা চর্বির মতোই অন্তরে বসে যাবে। ওদের শঙ্কায় আকুল—আর এ দুই-ই দেবতাদের বড় প্রিয়। এ-ধরনের পাপীদের পেলে দেবতারা খুশিই হন। তুমি কি দেবতাদের অনুগ্রহ থেকে ওদের বঞ্চিত করবে? পরিবর্তে ওদের তুমি কীই বা দিতে পারো? ছোট্ট শহরের দৈনন্দিন জীবনের সীমাহীন একঘেয়েমি আর সেই বিরামহীন ক্লান্তি! বিলম্বিত বৈশাখী প্রহরের অলস মায়ামাখা জীবনের ক্লান্তি। আহ্ সে যে কী আত্মঘাতী ক্লান্তি! হে বালক, ফিরে যাও। ফিরে যাও। এ শহরের অসহায় লোকগুলোর জীবনের শান্তি একখণ্ড সুতোর প্রান্তে ঝুলছে। এ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছ কি এদের সর্বনাশ ডেকে এনেছ। [*অরেস্টিসের চোখে চোখ রেখে*] সে সর্বনাশের আগুন তোমাকেও রেহাই দেবে না জেনো।

অরেস্টিস ॥ বটে? তাহলে এইই আপনি ওকে বলতেন। আর আমি সে যুবক হলে কী উত্তর দিতাম জানেন, বলতাম—[*হিংস্র দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকায়, গৃহশিক্ষকের কাশি*] না, জানি না, জানি

না—কী আমি বলতাম। হয়তো আপনার কথাই ঠিক। বিশেষ করে আমি যখন এর সাতেপাঁচে নেই—সেক্ষেত্রে আমার তো জানার কথা নয়।

জীয়ূস ॥ বেশ! অরেস্টিসেরও এমন সুমতি হোক সে আশাই আমি করব। তা আমার এখন যেতে হয়। সালাম বন্ধু।

অরেস্টিস ॥ সালাম।

জীয়ূস ॥ ওহো, ভালো কথা! এই নচ্ছার মাছিগুলো খুব বেশি জ্বালাতন করলে, ওদের হাত থেকে রেহাই পাবার একটা উপায় বাৎলে দিয়ে যাই—জেনে রাখুন। ওই দেখুন এক দঙ্গল মাছি আপনার মাথার উপর ভন্‌ভন্‌ করছে। বেশ। এবার দেখুন—হাতের কব্জিতে কেমন টপাশ করে আঘাত করলাম। তারপর হাতটাকে এমন করে নাড়বেন। তারপর আমার মতো বলবেন : আন্তর মন্তর ছুঃ! এই-যে দেখুন কেমন ঝরঝর করে মাটিতে পড়ে কিলবিল করছে শুঁয়োপোকার মতো।

অরেস্টিস ॥ ওরে বাপ রে!

জীয়ূস ॥ ও কিছু নয়! সামান্য হাতছাফাই। অবসর সময়ে মাছির উপর মন্ত্র চালিয়ে আমোদ পাই। আচ্ছা আসি তাহলে। দেখা হবে।

*[জীয়ূসের প্রস্থান]*

# প্রথম অঙ্ক

## দ্বিতীয় দৃশ্য

অরেস্টিস ॥ গৃহশিক্ষক

গৃহশিক্ষক ॥ হুঁশিয়ার। লোকটা কিন্তু জানে আপনি কে।

অরেস্টিস ॥ লোক! তুমি কাকে বলছ? ওকি মানুষ নাকি!

গৃহশিক্ষক ॥ আপনার কথা শুনে বড় দুঃখ হয় প্রভু। আপনি প্রশ্ন করছেন ওকি মানুষ নাকি। না, আমার শেখানো সবকথা, সবকিছুই বরবাদ হল দেখছি। সেই সহাস্য সন্দেহবাদেরও দেখছি কোনো প্রভাব পড়েনি আপনার উপর। কসম খেয়ে বলছি মানুষ ছাড়া এই দুনিয়ায় আর কিছু নেই। তার বেশিকিছু থাকতে পারে না। আর ঐ দাড়িঅলা লোকটা-যে মানুষ সে হলপ করে বলছি। ইজিসথাসের পোষা কোনো টিকটিকি হবে হয়তো বা।

অরেস্টিস ॥ আরে রাখো তোমার দর্শনের ঐ বুলি। মাথাটা যা খেয়েছ তাই যথেষ্ট, আর না।

গৃহশিক্ষক ॥ মাথা খেয়েছি! আমি! কারো মনের সংস্কারের বন্ধন মুক্ত করে দেয়াটাকে কি আপনি মাথা খাওয়া বলেন? উফ! কী সাংঘাতিক পরিবর্তন! অথচ একদিন আপনার মনের কোনো কথাই গোপন ছিল না আমার কাছে...কিন্তু আজ! যাক অন্তত কী ভাবছেন সে-কথা তো বলতে

পারেন! আমায় কীজন্যে টেনে এনেছেন এখানে? কী উদ্দেশ্যে।

অরেস্টিস ॥ উদ্দেশ্য! কোনো উদ্দেশ্যের কথা কি বলেছিলাম কখনো? যাক, যথেষ্ট হয়েছে। এবার চুপ করো দেখি! [*রাজপ্রাসাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে*] এই আমার প্রাসাদ। এখানেই আমার পিতার জন্ম আর এখানেই এক বারবনিতা আর তার অবৈধ প্রেমিক মিলে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। আমারও জন্ম এখানেই। আমার বয়স তখন বছর-তিনেক। ইজিসথাসের চামুণ্ডারা আমায় এখান থেকে বের করে নিয়ে গেল। খুব সম্ভব ওই দুয়ার দিয়েই। ওদের একজন আমায় কোলে নিয়েছিল। আমি তখন জেগে। নিশ্চয়ই খুব কাঁদছিলাম। কিন্তু তবু তার কিছুই আজ আর মনে পড়ে না। কিস্‌সু না। আমি পুরনো ফ্যাশানের গাম্ভীর্যদীপ্ত একটা বিশাল মৌন অট্টালিকার দিকে তাকিয়ে আছি। অথচ মনে হচ্ছে আমি যেন এটাকে দেখছি জীবনে এই প্রথমবারের মতো।

গৃহশিক্ষক ॥ কোনোকিছুই মনে পড়ছে না, হুজুর। বেশক নাফরমানি বলতে হবে। দশটা বছর ধরে আমি কী প্রাণান্ত পরিশ্রম করেই না এতকিছু শেখালাম। কত জায়গায়ই না ঘুরে বেড়ালাম। কত শহরই না দেখালাম। সব বেমালুম ভুলে গেছেন! সেই-যে স্থাপত্য সম্পর্কে বিশেষ পাঠ দিলাম তাও! অথচ প্রাসাদ, মন্দির, অট্টালিকা কত কিছুই না দেখেছেন আপনি। সব মিলিয়ে গ্রিসের ওপর একটা ভালো নির্দেশিকাও লিখে ফেলতে পারেন ইচ্ছে করলে।

অরেস্টিস ॥ প্রাসাদ! তাই!—অগুনতি প্রাসাদ, স্তম্ভ, মর্মরমূর্তি—পাথর আর পাথর। এক-একবার ভাবি এত পাথর

মাথায় নিয়ে মাথাটা আরো ভারী বোধ হচ্ছে না কেন! আর এতই যখন বলছ, ইফিসাসের মন্দিরের তিনশ সাতাশিটি সোপানের কথাই বা বলছ না কেন? একের পর এক সে সোপানগুলো ভেঙে আমি উপরে উঠেছি। ওর প্রত্যেকটি সোপানই আমার মুখস্থ। যতদূর মনে পড়ে ওর সপ্তদশ সোপানটি বেশ খানিকটা ভাঙা। কিন্তু তবু... বাহ্, এ যে দেখছি আমাদের পুরনো বুড়ো কুকুরটা খড়ের গাদার ওম ছেড়ে শিথিল পাদুটো টেনে টেনে কেমন এগিয়ে আসছে তার প্রভুকে স্বাগত জানাতে। ওই বুড়ো কুকুরটার স্মৃতিও আমার চাইতে তীক্ষ্ণ। অন্তত সে তার প্রভুকে তো চিনতে পারছে। তার নিজের প্রভু! কিন্তু আমার আপন বলতে কী আছে?

গৃহশিক্ষক ॥ কেন, আপনার বৈদগ্ধ্য আর কৃষ্টি! সে কি আপনার নয়! আপনার সেই বৈদগ্ধ্যকে আমি তিলে তিলে লালন করেছি। আমার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ফুলে আমি পরম দরদে গেঁথেছি যে-ফুলহার সে কি আপনার নয়! গোড়া থেকেই আমি আপনাকে সব রকমের বই-ই পড়িয়েছি, যাতে মানুষের মনের অন্তহীন বৈচিত্র্য আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কতবারই না আপনাকে বলেছি মানুষের বিশ্বাস আর রীতিনীতির বিপুল পার্থক্যের কথা। আর তাই আপনার যৌবনদীপ্ত সৌম্যকান্তি আর অর্থসম্পদের সাথে আপনি পেয়েছেন প্রবীণের প্রজ্ঞা। আপনার মন তাই সকল সংস্কারের ঊর্ধ্বে। আপনার তাই নাই কোনো বন্ধন, নাই ধর্ম, নাই কোনো পেশা। আপনি মুক্ত, তাই সব পথই আপনার সামনে অবারিত। কিন্তু পথের

হাতছানিকে আপনি উপেক্ষা করতে পারেন, আর সেটাই আপনার সকল শক্তির রহস্য। এককথায় সাধারণ মানুষের বহু ঊর্ধ্বে, প্রতিভায় দীপ্ত আপনি। যে-কোনো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য কিংবা দর্শনের অধ্যাপক হবার যোগ্যতা আপনার আছে। কিন্তু তবু নিজ ভাগ্যের প্রতি কেন আপনার এই অভিযোগ?

অরেস্টিস ॥ না, এ ঠিক অভিযোগ নয়। কিসের বিরুদ্ধেই বা অভিযোগ করব বলো। তুমি আমায় সকল সংস্কারের বাঁধন থেকে মুক্ত করেছ। মাকড়সার জালের যে ছেঁড়া সুতো দিশাহীনভাবে ইতস্তত বাতাসে ভেসে বেড়ায় তারই মতো করেছ উদ্দাম বাঁধনহারা। মসলিনের মতোই হালকা। ভারমুক্ত হাওয়ায় ভাসছি আমি। জানি আমি ভাগ্যবান। ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন আর তা বোঝার ক্ষমতাও আমার আছে। [*কিছুক্ষণ থেমে*] কারো কারো জন্মই হয় নির্দিষ্ট গণ্ডিতে। সে গণ্ডির বাইরে পা দেয়ার ক্ষমতা তাঁদের নেই। সে ছককাটা পথেই তাঁদের চলতে হয়। সে পথের শেষে একটা বিশেষ কর্তব্যও থাকে পূর্ব-নির্ধারিত, যা তাঁদেরও অবশ্য করণীয়। সুতরাং প্রস্তরাঘাতে ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত পাদুটি টেনে টেনে পথ চলেন তাঁরা মন্থরগতিতে। কিন্তু তবু তাঁদের সে চলায় থাকে একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চলার আনন্দ। অবশ্য তোমার কাছে সে-আশা হয়তো নিতান্তই লঘু, ইতরজনোচিত। অন্যদিকে, এমনকিছু লোক রয়েছে যাঁরা স্বল্পভাষী—যাঁদের সারা অন্তরজুড়ে একটা বিষাদময় ভাবনার ভার—যাঁদের সারাজীবনের গতি বদলে গেছে, কারণ

ছোটবেলায় একদিন বয়স যখন পাঁচ কি সাত...হ্যাঁ। আমি এ-কথা মানতে রাজি, ব্যক্তি হিশেবে এরা মহৎ নন। সাত বছর বয়স থেকেই আমি জানি আমার কোনো ঠাঁই নেই—নেই কোনো মোহবন্ধন। আমার চারপাশে এই অনুপম শব্দগন্ধ, ছাদে বর্ষার রিমঝিম, কিংবা সোনালি ভোরে রৌদ্রের ঝিকিমিকি এ সবকিছুই আমাকে পাশ কাটিয়ে গেছে। জানি এ আমার নয়। এরা কখনোই আমার কৈশোরের স্মৃতিতে একাত্ম হবে না। কারণ স্মৃতি একধরনের বিলাসিতা, যা কিনা তাদেরই সাজে যাদের আবাস আছে, জমি আছে, আছে দাসদাসী আর একপাল হালের বলদ। কিন্তু আমার...ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি হাওয়ার মতো হালকা, বন্ধনহীন, নির্মোহ। আমার এ মনটি একান্তই আমার, নৈঃশব্দ্যের আলোকে দীপ্র। [*প্রাসাদের দিকে এগিয়ে*] হয়তো আমি ওই প্রাসাদেই লালিত হতাম। সেক্ষেত্রে তোমার বইগুলো আমার কোনোদিনই পড়া হত না। হয়তো পড়তেই শিখতাম না। একজন গ্রিক যুবরাজের পক্ষে পড়তে শেখাটা খুবই অস্বাভাবিক কিনা! কিন্তু এই দুয়ার দিয়ে আমার আগমন আর নির্গমন হত লক্ষবার। শৈশবে এই দরজার পাটদুটো নিয়ে হয়তো খেলা করতাম। পাটদুটোকে দুহাতে ঠেলে হয়তো করতাম শক্তির পরীক্ষা। তাতে কাঠের ফাঁকে হয়তো ক্যাঁচ করে শব্দ উঠত, কিন্তু ওই সুবিশাল দরজা টলত না এতটুকু। পরে কিছুটা বড় হলে রাতের অন্ধকারে হয়তো দুয়ারের পাটদুটো খুলতাম চুপিচুপি—উন্মুখ অভিসারের দুর্বার বাসনায়। আরো কিছুকাল পর

হয়তো আমার অনুচরেরা খুলে দিত ওই দুয়ার আর আমি ঘোড়ায় চেপে টগবগ করে পার হয়ে যেতাম ওই সিংহদুয়ার। আমার বড় সাধের কাঠের দরজা! ওতে চাবির ফোকরটা হয়তো খুঁজে পেতাম চোখ বুজেই। আর ওই-যে ছোট ছিদ্র দেখছ, ওটা আমিই হয়তো করতাম, প্রথম যেদিন ওরা বর্শা নিক্ষেপে তালিম দিত আমায়। [*কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে*] দেখি, দেখি! ওটাই তো ডোরীয় শিল্পরীতি, তাই না! এই সোনালি কাজটা কেমন বলো দেখি! অমনটা দেখেছিলাম ডোডোনায়। চমৎকার নকশিকাজ! যা হোক, এবার কিন্তু এমন কিছু একটা বলব যা শুনে তুমি খুশি হবে। এ প্রাসাদ আমার নয়। এ দুয়ারও আমার নয়। এর কিছুই আমাদের পিছুটানের কারণ হতে পারে না।

গৃহশিক্ষক ॥ যাক, এতক্ষণে তবু কিনা বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছেন! এই শহরে মানুষ হলে কী লাভ হত বলুন দেখি! এ্যাদ্দিনে আপনার আত্মা পীড়িত হত একটা ধিক্কৃত অনুশোচনার জ্বালায়।

অরেস্টিস ॥ [*উৎসাহভরে*] তাহলেও সে তো হত আমারই অনুশোচনা। এই-যে বৈশাখী রোদে আমার চুলে পোড়া গন্ধ সেও তো আমারই। আর এই মাছিদের একঘেয়ে ভনভন সেও আমার। এই মুহূর্তে প্রাসাদের পশ্চাতে কোনো অন্ধকার ঘুমঘরে নগ্ন হয়ে শুয়ে জানালার ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতাম একঝলক আলোর রশ্মি—অপেক্ষায় থাকতাম সূর্যাস্তের, অপেক্ষায় থাকতাম একটি মনোরম গোধূলির যা সন্ধ্যার অন্ধকারে জেগে উঠত একটা মিষ্টি সোঁদা গন্ধের মতো। আরগোসের একটি সন্ধ্যা! আরো হাজারো সন্ধ্যার মতো অতিপরিচিত

হয়েও যা চিরনতুন! আরেকটি সন্ধ্যা যা আমারই হওয়া উচিত! না, না, চলো ফেরা যাক। অন্যের পুলককে নিজের ভেবে কাজ নেই।

গৃহশিক্ষক ॥ প্রভু, বড় স্বস্তি পেলাম! গত কয়েক মাস ধরে, মানে যখন থেকে আপনার জন্মরহস্য সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করেছি তখন থেকে লক্ষ করেছি আপনি যেন কেমন বদলে যাচ্ছেন। তা দেখে কত-যে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি। আমি বড্ড ভয় পাচ্ছিলাম!

অরেস্টিস ॥ কেন! কিসের ভয়!

গৃহশিক্ষক ॥ থাক, শুনে কাজ নেই। রাগ করবেন আপনি।

অরেস্টিস ॥ না, বল শুনি!

গৃহশিক্ষক ॥ মনটা ছোটবেলা থেকে সন্দেহবাদ আর কৌতুকময় জীবনবোধের ছাঁচে ঢালাই বলেই কখনো-কখনো কল্পনাবিলাস অনিবার্য। মোদ্দা কথা, ভাবছি জিজ্ঞেস করব ইজিসথাসকে তাড়িয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার কোনো উদ্ভট বাসনা আপনার আছে কিনা!

অরেস্টিস ॥ ইজিসথাসকে তাড়িয়ে...[*থেমে*] না হে পণ্ডিতপ্রবর, ভয় নেই। সে-কাজের অনেক দেরি হয়ে গেছে। লোকচক্ষে পূজ্যপাদ এই ঘৃণ্য শয়তানটার দাড়ি ধরে হিড়হিড় করে টেনে আমার পিতার সিংহাসন থেকে ওকে নামাবার বাসনায় আমি উদগ্রীব নই। কিন্তু কেন? এই লোকগুলোর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এদের কারো সন্তানের জন্ম আমি দেখিনি, কন্যার বিবাহে শরিক হইনি। ওদের এই অনুশোচনার ভাগীদারও নই আমি। ওদের কাউকেই নামে পর্যন্ত চিনিনে! ওই দাড়িঅলা লোকটার কথাই ঠিক—রাজাকে তার প্রজার স্মৃতির

অংশীদার হতে হয়। সুতরাং ওদের ঘাঁটাতে চাইনে আমি। চলে যেতে চাই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। কিন্তু যদি এমন হত, বুঝলে! যদি পারতাম এই শহরকে এর মুক্তি, এর স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে—যদি খুনের অপরাধ মাথায় নিয়েও পারতাম ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ওদের স্মৃতি আর ভীতিকে আপন বলে গ্রহণ করতে, তাহলে হ্যাঁ! তাহলে আমার মাকে খুন করে হলেও..

গৃহশিক্ষক ॥ চুপ করুন প্রভু! কেউ শুনে ফেলবে।

অরেস্টিস ॥ হ্যাঁ, জানি এসবই কল্পনাবিলাস মাত্র। চলো এবার যাওয়া যাক। একটু তালাশ করে দ্যাখো কোথাও একটা ভালো ঘোড়া মেলে কিনা। তাহলেই স্পার্টায় যাওয়া যায়! ওখানে আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু রয়েছেন।

## তৃতীয় দৃশ্য

পূর্বের দৃশ্য—ইলেকট্রা

ইলেকট্রা একটা ময়লার টিন হাতে এগিয়ে আসে। ওদের না-দেখেই জীয়ুস-এর মূর্তির সামনে এসে দাঁড়ায়

ইলেকট্রা ॥ [*মূর্তিকে উদ্দেশ করে*] বজ্জাত কোথাকার! বড় বড় চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছিস যে বড়। মুখখানা তো ময়রার ভিয়েনের মতো রসে টুপটুপ, হুতোম মার্কা! বজ্জাত! শয়তান! তাকা না, তাকা! ভয় আমি একটুও পাইনে তোকে। ঐ

পুণ্যবতী মহিলারা আজই ভোরে কালো পোশাক পরে তোর পুজো দিতে এসেছিল। বড় বড় জুতো পায়ে ঠকাস ঠকাস নেচে গিয়েছে। তোর তো তাতে আহ্লাদের সীমা নেই। ঠক্, জোচ্চোর, তুই তো ওই বুড়ি ধাড়িগুলোকে ভালোবাসিস। ওরা যতই মৃতদের দিকে এগোয়, তোর পীরিতও ততই বাড়ে। ওরা অতি উত্তম সুরা ঢেলেছে তোর পায়ে। কারণ আজ তোর পুজোর দিন, তোর মচ্ছব। কিন্তু তুই ওদের ওই বাসি অন্তর্বাসের গন্ধ শুঁকিসনি তোর এই নাকের ছিদ্দির দিয়ে? [*মূর্তির গায়ে নিজেকে চেপে ধরে*] নে, শুঁকে দ্যাখ! কুমারী দেহের মিষ্টি সুবাস! হ্যাঁ, আমি নবীনা, উদ্ভিন্নযৌবনা। কিন্তু তোর তো জীবন আর যৌবনকে বড় ভয়! এই দ্যাখ, সারাটা শহর যখন তোর পুজো দিতে নীরবে নতজানু। এই দ্যাখ আমিও এসেছি তোর পুজোর অর্ঘ্য নিয়ে। এই নে, দ্যাখ কী এনেছি! চুলোর ছাই, আলু পটলের খোসা, বাসি খাবার, যাতে কিলবিল করছে একরাশ ক্রিমি; মাটিমাখা রুটির টুকরো, যা আমাদের শুয়োরগুলোও খায় না—তোর ঐ মাছিগুলোর জন্য একবারে মচ্ছব। শুভ হোক, তোর এই পুজোর উৎসব! আর এই অবাঞ্ছিত কামনার এই যেন হয় ইতি। তোকে হেঁচকা টানে ধুলোয় লুটিয়ে দেই এমন শক্তি আমার নেই। কিন্তু তোর মুখে থুতু দিতে তো পারি! সেইটেই বুঝিবা একমাত্র কাজ যা করার শক্তি আমার আছে। কিন্তু জানিস সে আসবে। আমি যার প্রতীক্ষায় আছি সে আসবে দীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ তরবারি

হাতে। সে এই এমন করে কোমরে হাত দিয়ে, মাথাটা পেছনে হেলিয়ে তোকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখবে আর বিদ্রূপের হাসি হাসবে। তারপর এই এমন করে এক কোপে তোকে দুখণ্ড করবে। খণ্ডিত জীয়ূস ধুলায় লুটাবে। একখণ্ড বাঁয়ে গড়াগড়ি যাবে, আর-একখণ্ড ডানে। সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখবে মৃতদের দেবতা জীয়ূস একখণ্ড নিরেট কাঠের তৈরি ঠুঁটো জগন্নাথ বই আর কিছু নয়। দেখবে তোর ঐ ভয়াল রক্তমাখা চেহারা, আর সবুজ চোখ এ সবই একপোঁচ রঙের কেরামতি ছাড়া আর কিছু নয়। তুই তো জানিস, তোর ভেতরটা একখণ্ড নিরেট শাদা কাঠ মাত্র—শিশুর কোমল দেহের মতো শাদা। তুই তো জানিস, তরবারির এক কোপে তা দ্বিখণ্ডিত হবে, একফোঁটা রক্তও ঝরবে না তাতে। একটুকরো শাদা কাঠ। চমৎকার কাঠ! জ্বলবে ভালো! [*অরেস্টিসকে দেখে*] এ্যাঁ!

অরেস্টিস ॥ ভয় পেয়ো না!

ইলেকট্রা ॥ ভয় আমি পাইনি! একটুও ভয় পাইনি! কিন্তু, তুমি কে?

অরেস্টিস ॥ আমি আগন্তুক, মুসাফির।

ইলেকট্রা ॥ তাহলে স্বাগত জানাই! এ শহরের যা-কিছু অচেনা, অজানা তার সবই আমার প্রিয়। তা তোমার নাম?

অরেস্টিস ॥ ফিলেবুস। করিন্থ থেকে আসছি।

ইলেকট্রা ॥ বা! করিন্থ থেকে! আমার নাম ইলেকট্রা।

অরেস্টিস ॥ ইলেকট্রা... [*গৃহশিক্ষকের প্রতি*] এখান থেকে সরে যাও।

[*গৃহশিক্ষকের প্রস্থান*]

## চতুর্থ দৃশ্য

অরেস্টিস-ইলেকট্রা

ইলেকট্রা ॥ অমন করে তাকাচ্ছ কেন আমার দিকে?

অরেস্টিস ॥ তুমি অনিন্দ্যসুন্দরী। এখানকার এই দেহাতী লোকগুলোর সঙ্গে একটুও মিল নেই তোমার।

ইলেকট্রা ॥ সুন্দরী! সত্যি বলছ আমি সুন্দরী? করিন্থের মেয়েদের মতো সুন্দরী?

অরেস্টিস ॥ হ্যাঁ।

ইলেকট্রা ॥ এখানে কেউ আমাকে সুন্দরী বলে না। ওরা চায় না আমি জানতে পাই আমি সুন্দরী। আর তাছাড়া সুন্দর দিয়ে আমার হবেই-বা কী? আমি তো হুকুমবরদার বাঁদী ছাড়া কিছু নই!

অরেস্টিস ॥ বাঁদী! তুমি!

ইলেকট্রা ॥ বাঁদীরও অধম আমি। রাজারানীর অন্তর্বাস ধুয়ে দেই আমি। কী বিচ্ছিরি ময়লা আর পূতিগন্ধময় অন্তর্বাস। আমাকে সব ধুতে হয়, সব! ওদের পরনের সব কাপড়—যে-কাপড়ে ওরা ওদের ওই দুর্গন্ধময় দেহের লজ্জা নিবারণ করে, যে-অন্তর্বাস পরে রানী ক্লাইটেমনেস্ট্রা রাজার বিছানায় শোয়। আমি চোখ বুজে সেই উচ্ছিষ্ট পরিধেয়কে প্রাণপণে ঘসি। রান্নাঘরের ধোয়া-মোছাও আমিই করি। বিশ্বাস হচ্ছে না, না! এই দ্যাখো, আমার হাত! দ্যাখো, ফেটে কেমন চৌচির হয়ে গেছে হাতের

চামড়া। কি, অমন হতভম্বের মতো তাকাচ্ছ যে! আমার হাত দেখে কি কোনো রাজদুলালীর পেলব বাহুবল্লরী বলে ভুল হয়?

অরেস্টিস ॥ ইস্! না তা হয় না ঠিকই! কিন্তু থামলে কেন। বলো আর কী কী কাজ ওরা তোমাকে দিয়ে করায়?

ইলেকট্রা ॥ বেশ! তবে শোনো। প্রতিদিন সকালে আমাকে আবর্জনার এই টিনগুলো পরিষ্কার করতে হয় রাজপ্রাসাদ থেকে বয়ে এনে—তা নিজেই তো দেখলে কোথায় ফেললাম। এই যে দেখছ, এই কাঠের জগন্নাথ, ইনি হচ্ছেন দেবতা জীয়ূস। মাছি আর মৃতদের দেবতা। সেদিন না, ভারি মজা হয়েছে! প্রধান পুরুত এলেন দেবতাকে পেন্নাম করতে। এসেই দিলেন কপির ডাঁটা আর আমের আঁটি মাড়িয়ে। ব্যস! পাগল হয়ে যাবার জোগাড় আর কী! এই, তুমি আবার বলে দেবে না তো ওদের?

অরেস্টিস ॥ না।

ইলেকট্রা ॥ দাও না বলে, ইচ্ছে করলে! বয়েই গেল তাতে! ওরা আমাকে নিয়ে আর বেশি কী করবে। মারবে এই তো! তা, মার কি কম খেয়েছি নাকি! চিলেকোঠায় বন্দি করে রাখবে? সেটা নেহাত মন্দ হবে না। দিনান্তে ওরা আমায় খাটুনির ইনাম দেয়। এক দীর্ঘাঙ্গিনীর সামনে আমাকে দাঁড়াতে হয় প্রতি রাতে। কলপ-মাখা কালো চুল, স্থূল দুটি ঠোঁট, শুভ্র হাত—শুভ্রসুন্দর সম্রাজ্ঞীর হাত, যে-হাতে চাকভাঙা মধুর সৌরভ। মহিলা আমার কাঁধে সে হাতদুটি রেখে ভারি ঠোঁটের স্পর্শ আমার কপালে দিয়ে বলেন—শুভরাত্রি ইলেকট্রা!

প্রতি রাতে! উফ্! প্রতি রাতে সে-স্পর্শ আমাকে সইতে হয়। যেন একটা ক্ষুধার্ত মাংসপিণ্ডের তপ্ত উষ্ণ স্পর্শ। আমি কিন্তু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। পড়ে যাইনে কখনো। হয়তো বুঝতে পারছ, এইই আমার মা। চিলেকোঠায় বন্দি রাখলে মায়ের ঠোঁটের সে-স্পর্শ থেকে বরং কিছুটা রেহাই পেতাম।

অরেস্টিস ॥ আচ্ছা, পালাবার কথা ভাবোনি কখনো?

ইলেকট্রা ॥ না, সে-সাহস নেই। গাঁয়ের পথে রাতবিরেতে একলা পথচলার সাহস আমার নেই।

অরেস্টিস ॥ সঙ্গে যেতে পারে এমন কোনো বান্ধবীও নেই বুঝি?

ইলেকট্রা ॥ না, আমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। এরা সবাই বলে আমি নাকি অলক্ষুণে, অপয়া। সুতরাং বান্ধবী আর পাচ্ছি কোথায়?

অরেস্টিস ॥ কেন, বৃদ্ধা দাই মা, যার হাতে তোমার জন্ম। সে তো নিশ্চয়ই ভালোবাসে তোমায়!

ইলেকট্রা ॥ না সেও না। মাকে জিজ্ঞেস কোরো, বলবেন আমাকে দেখলে নাকি সাক্ষাৎ দয়ার সাগরও শুকিয়ে যায়।

অরেস্টিস ॥ সারাটা জীবন তুমি এখানে, এভাবে কাটিয়ে দেবে?

ইলেকট্রা ॥ [*কান্নায় ভেঙে পড়ে*] সারাজীবন! না, আলবৎ না! আমি প্রতীক্ষায় রয়েছি।

অরেস্টিস ॥ কিসের! কারা!

ইলেকট্রা ॥ উঁহুঁ! সে-কথা বলছিনে! বড্ড বকি আমি। সে যাই হোক, তুমি কিন্তু বেশ সুপুরুষ। থাকবে কিছুকাল এখানে?

অরেস্টিস ॥ ভেবেছিলাম আজই যাব। কিন্তু এখন...

ইলেকট্রা ॥ এখন কী?

অরেস্টিস ঃ এখন ভাবতে হবে কী করব।

ইলেকট্রা ঃ আচ্ছা করিন্থ খুব সুন্দর শহর, না!

অরেস্টিস ঃ হ্যাঁ, খুব।

ইলেকট্রা ঃ তোমার বুঝি খুব পছন্দ! খুব গর্ব তোমার করিন্থকে নিয়ে!

অরেস্টিস ঃ হুঁ।

ইলেকট্রা ঃ নিজের শহরকে নিয়ে গর্ব, ভাবতেও অবাক লাগে, হাসিও পায়। বুঝিয়ে বলো না সে কেমন অনুভূতি!

অরেস্টিস ঃ মানে—না জানিনে। বুঝিয়ে বলতে আমি পারব না।

ইলেকট্রা ঃ পারবে না...[*নীরবতা*] আচ্ছা সত্যি নাকি? শুনেছি করিন্থে আছে অসংখ্য ছায়াবীথি, মনোরম উপবন, সেখানে সন্ধ্যায় কোমল অন্ধকারে নগরবাসীরা বেড়াতে বের হয়।

অরেস্টিস ঃ হ্যাঁ।

ইলেকট্রা ঃ সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে আসে? সবাই বেড়াতে বের হয়!

অরেস্টিস ঃ সবাই। গোধূলি লগ্নে সবাই বেরোয়।

ইলেকট্রা ঃ ছেলেমেয়েরা একসাথে!

অরেস্টিস ঃ হ্যাঁ, একসাথে।

ইলেকট্রা ঃ ওদের একের সাথে অন্যের বলার মতো অফুরন্ত কথা থাকে, না! আর একে অন্যের কাছে থাকতে ভালোবাসে, না! অনেক রাত অবধি বুঝি শোনা যায় ওদের মিলিত কণ্ঠের উচ্চকিত হাসি!

অরেস্টিস ঃ তাই!

ইলেকট্রা ঃ আচ্ছা আমার কথাগুলো তোমার নিশ্চয় খুব ছেলেমানুষি ঠেকছে। আমার না, ভাবতে ভীষণ দুর্বোধ্য ঠেকছে—ছায়াবীথির তলে যুগলবিহার, সঙ্গীত আর উচ্চকিত হাসি, এর কিছুই কল্পনায়

মূর্ত হয়ে উঠছে না। এখানকার সবাই একটা ভীতির পীড়নে জর্জরিত—আর আমি...

অরেস্টিস ॥ তুমি...

ইলেকট্রা ॥ হ্যাঁ, আমি জর্জরিত হয়েছি...ঘৃণার আগুনে। আচ্ছা করিন্থের মেয়েরা সারাদিন কী করে?

অরেস্টিস ॥ ওরা অতি যত্নে সুন্দর করে সাজে। তারপর হয় গান গায়, নাহয় বাঁশি বাজায় কিংবা বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যায় আর, রাতে—নাচতে যায়।

ইলেকট্রা ॥ আচ্ছা, ওদের জীবনে কোনো ভাবনা নেই?

অরেস্টিস ॥ আছে, সেগুলো ছোটখাটো।

ইলেকট্রা ॥ আচ্ছা, শোনো! করিন্থের নগরবাসীদের কোনো অনুশোচনা হয় না!

অরেস্টিস ॥ হয়, সে কালেভদ্রে।

ইলেকট্রা ॥ সুতরাং, ওরা ওদের খুশিমতো চলে। চলার শেষে তা নিয়ে মিথ্যে ভাবতে বসে না।

অরেস্টিস ॥ সেই ওদের চলার ছন্দ!

ইলেকট্রা ॥ আশ্চর্য! [*নীরব থেকে*] আচ্ছা আরেকটা জবাব দাও দেখি। আমার জানা প্রয়োজন, কারণ আমি একজনের প্রতীক্ষায় আছি। আচ্ছা ধরো করিন্থের কোনো যুবক, যে রাতের আঁধারে বান্ধবীর হাত ধরে হেসে-খেলে বেড়ায়,—দীর্ঘদিনের প্রবাস থেকে ফিরে এসে দেখল তাঁর পিতা আততায়ীর হাতে নিহত, মা সেই ঘৃণ্য ঘাতকের ঘরণী, আর তার বোন ক্রীতদাসীর মতো নিগৃহীতা—তাহলে, তাহলে সে যুবক কী করবে? সে কি ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা খুঁজবে তার বান্ধবীদের উষ্ণ সাহচর্যে, নাকি তরবারি উন্মুক্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই ঘাতকের বুকে—টুকরো টুকরো করে কাটবে তার দেহকে...ওকি, তুমি চুপ করে রইলে যে?

অরেস্টিস ঃ আমি জানি না।

ইলেকট্রা ঃ বারে! জানি না বলছ কেন?

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ঃ [*নেপথ্যে*] ইলেকট্রা!

ইলেকট্রা ঃ চুপ।

অরেস্টিস ঃ কী হল? কে ডাকে?

ইলেকট্রা ঃ আমার মা, রানী ক্লাইটেমনেস্ট্রা।

## পঞ্চম দৃশ্য

অরেস্টিস, ইলেকট্রা, ক্লাইটেমনেস্ট্রা

ইলেকট্রা ঃ ব্যাপার কী ফিলেবুস! ভয় পেলে নাকি?

অরেস্টিস ঃ [*স্বগত*] এই সে মুখ, যাকে কল্পনায় মূর্ত করে তুলতে চেয়েছি হাজার বার। অবশেষে দেখছি তাঁকে, উৎকট প্রসাধনীর আড়ালে লুকানো ক্লিষ্ট বিবর্ণ একটি মুখ। কিন্তু, কিন্তু তাঁর চোখগুলোকে এমন প্রাণহীন, ফ্যাকাসে দেখব এমন তো ভাবিনি।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ঃ ইলেকট্রা, রাজার আদেশ, তোকে উৎসবের জন্য তৈরি হতে হবে। পরতে হবে কৃষ্ণবসন আর রত্নালঙ্কার। কি অমন করছিস কেন! মাটির দিকে তাকাচ্ছিস কেন, বাহুদুটি বা অমন চেপে ধরছিস কেন—নিজের শরীরটাকে নিয়ে কী করবি যেন ভেবে পাচ্ছিস নে! কিন্তু ভবি ভুলছে না। কেন, কিছুক্ষণ আগে জানালা দিয়ে দেখলাম—সপ্রতিভ, কলকণ্ঠ, দীপ্রচক্ষু এক অন্য ইলেকট্রাকে, কিন্তু আমার সামনে এলেই এমন

করিস কেন? এই তাকা, তাকা আমার চোখে। জবাব দে আমার কথার।

ইলেকট্রা ॥ তোমার এই উৎসবের শানশওকত আর রৌশনাই বাড়িয়ে তুলতে আমার মতো এমন একটা জবুথবু ঝিয়ের কি একান্তই দরকার, মা?

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ নাটুকেপনা রাখ দিকিন! তুই রাজকন্যা। প্রতিবারের মতো এবারও প্রজারা তোকে দেখবার প্রতীক্ষায় থাকবে।

ইলেকট্রা ॥ রাজকন্যা! হ্যাঁ, একদিনের রাজকন্যা। প্রতি বছর এই দিনটিতেই কেবল তোমার মনে পড়ে আমি কে। কারণ, প্রজারা রাজপরিবারকে একঝলক দেখে ধন্য হতে চায়। কী বিচিত্র এই রাজকন্যার জীবন। শুয়োরের পাল পোষা আর থালাবাসন ধোয়া যার একমাত্র কাজ। আচ্ছা, প্রতিবারের মতো ইজিসথাস কি এবারও জনসমক্ষে আমার গ্রীবায় হাত রেখে মিষ্টি করে হাসবে, তাঁর সেই হাসিটি অম্লান রেখে আমার কানে কানে উচ্চারণ করবে ভয়াল সাবধানবাণী?

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ সেটা নির্ভর করে তোর উপর। ওর আচরণ ভিন্নতর হবে না, যদি...

ইলেকট্রা ॥ যদি আমি ওই অনুশোচনা আর অপরাধবোধকে অবাধে সংক্রমিত হতে দেই আপন চেতনায়, করিনি এমন অপরাধের জন্য যদি দেবতাদের ক্ষমা ভিক্ষা করি। ইজিসথাসের হস্ত চুম্বন করে যদি ওকে পিতা বলে ডাকি। থুঃ। কথাটা ভাবলেই আমার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে। ওর নখের কোণে এখনো রক্ত লেগে আছে!

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ যা খুশি তাই কর্‌গে। নিজে তো তোকে কিছু করতে বলিনে সে অনেক দিন। আমি শুধু রাজার হুকুম তোকে জানিয়ে গেলাম।

ইলেকট্রা ॥ কেন আমি ওর হুকুম মানব। রাজা তো তোমার সোয়ামী মা, তোমার অতি আদরের সোয়ামী—আমার তো নয়?

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ আমার আর কিছু বলার নেই, ইলেকট্রা। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছিস তুই। সেইসঙ্গে আমাদেরও। আর আমিই বা তোকে কী করে সদুপদেশ দেই। মাত্র একটি সকাল আর তাতেই আমি আমার সারাজীবনের চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছি। জানি, তুই আমায় ঘৃণা করিস্। কিন্তু মা আমার প্রাণ একটা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে, যখন দেখি তুই আমার মতো হয়েছিস। সেই চিবুক, দীর্ঘ মুখমণ্ডল, রক্তে উদ্দাম চঞ্চলতা, চক্ষে সপ্রতিভ বুদ্ধির দীপ্তি। কিন্তু কি হল তাতে!

ইলেকট্রা ॥ বোলো না, বোলো না, তোমার সাথে কোনো মিলই চাইনে আমি। আচ্ছা ফিলেবুস তুমি তো আমাদের পাশাপাশি দেখছ। বলো দেখি আমি দেখতে মায়ের মতো কিনা।

অরেস্টিস ॥ কী বলব আমি। ওঁর মুখ প্রশস্ত একটা মাঠের মতো—শিলা আর ঘূর্ণিতে বিধ্বস্ত। তোমার মুখে একটা আসন্ন কালবোশেখীর গুমোট। তোমার এই অবাধ্য চিত্ত একদিন তোমার হাড় পর্যন্ত জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে।

ইলেকট্রা ॥ কালবোশেখীর গুমোট। বেশ! বেশ! এইটুকু মিল মেনে নিতে বাধা নেই! তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ তুমি! তুমি কে হে যুবক? তোমার চাহনি তো সপ্রতিভ। এসো দেখি একটু ভালো করে দেখি। তা, এখানে কীজন্য?

ইলেকট্রা ॥ ওর নাম ফিলেবুস। নিবাস করিন্থে। একজন মুসাফির।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ ফিলেবুস! ও!

ইলেকট্রা ॥ অন্য একটা নামে তোমার যেন বড় ভয় মা।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ ভয়! আমার নিজের জীবনে যে সর্বনাশ ডেকে এনেছি তাতে একটাই লাভ আমার হয়েছে। আর তা হচ্ছে সবরকম ভয়, শঙ্কা থেকে এখন আমি মুক্ত। এসো বিদেশী, স্বাগত জানাই তোমাকে। কী সবুজ, নবীন তোমার কান্তি। একেবারে কাঁচা। বয়স কত বাছা।

অরেস্টিস ॥ আঠারো।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ মা-বাবা বেঁচে আছেন?

অরেস্টিস ॥ বাবা নেই।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ কিন্তু তোমার মা? তোমার মায়ের বয়স বোধ করি আমার কাছাকাছি হবে। আহা, থামো, থামো তোমায় কিছু বলতে হবে না। ছেলের চোখে মায়ের বয়স নিশ্চয়ই আমার চেয়ে অনেক কম। তোমার কাছে বসে নিশ্চয়ই তিনি এখনও আনন্দে গান করে থাকেন। মাকে তুমি খুব ভালোবাসো না! কী হল, চুপ করে রইলে যে? মাকে ছেড়ে এলে কেন?

অরেস্টিস ॥ আমি স্পার্টায় যাচ্ছি। সৈন্যদলে নাম লেখাতে।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ পথিকেরা সাধারণত আমাদের এ শহরকে এড়াবার জন্য অনেকখানি পথ ঘুরে যায়। কেন, তোমায় কেউ হুঁশিয়ার করে দেয়নি? সমতলের বাসিন্দারা আমাদের স্পর্শ পর্যন্ত পরিহার করে চলে। আমাদের অনুশোচনা আর অপরাধবোধকে ওরা ভাবে বালাই—ভয়, পাছে ওদের মধ্যে সংক্রমিত হয়।

অরেস্টিস ॥ জানি সে-কথা।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ পনেরো বছর আগে সংঘটিত একটা অমার্জনীয় অপরাধের বোঝা আমরা বয়ে চলেছি এ-কথা বলেনি কেউ?

অরেস্টিস ॥ হ্যাঁ, বলেছে।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ বলেনি, রানীর অপরাধের বোঝাটাই সবচেয়ে ভারী—মানুষ ওর নাম শুনলে শিউরে ওঠে!

অরেস্টিস ॥ হ্যাঁ, তাও শুনেছি।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ এসব জেনেও তুমি এখানে এসেছ বিদেশী! আমি রানী ক্লাইটেমনেস্ট্রা।

ইলেকট্রা ॥ ওকে করুণা নয়, ফিলেবুস! আমাদের জাতীয় উৎসবে রানীর ভারি উৎসাহ। গণ-স্বীকারোক্তির সে উৎসবে রানী খুব পুলকিত বোধ করেন। প্রত্যেকেই প্রকাশ্যে নিজ নিজ পাপের স্বীকারোক্তি করে। ছুটির দিনে তাকিয়ে দেখলে এমন দৃশ্য বিরল নয়—দেখবে দোকানি দোকানের ঝাঁপি বন্ধ করে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে হাঁটুর ওপর ভর ক'রে। ধুলোবালি মেখে প্রাণফাটা চিৎকার করে বলছে : আমি খুনী, আমি ব্যভিচারী। কিন্তু এই খেলায় নগরবাসীদের এখন আর তেমন উৎসাহ নেই। প্রত্যেকেই একে অন্যের অপরাধ সম্পর্কে জানে। বিশেষ করে রানীর পাপে এখন আর কারো উৎসাহ নেই। রানীর পাপ এখন একটা আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার—বলতে পারো আমাদের আদিম অপরাধ। সুতরাং তোমার মতো এমন সতেজ, কাঁচা, নবীন কাউকে পেলে ওর পাপের কাহিনী শোনাবার যে মওকা, তার আনন্দ কী তা একবার ভেবে দ্যাখো দিকিন। মওকা বটে। মনে হবে সে বুঝিবা তার প্রথম স্বীকারোক্তির পুলক।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ চুপ কর্, তুই। যে কেউ দিকনা আমার মুখে থুতু, বলুক-না পাতকী, বলুক বেবুশ্যে; কিন্তু আমার সন্তাপে কেউ মন্দ বলবে এমন অধিকার কারো নেই।

ইলেকট্রা ॥ দেখলে, ফিলেবুস। দুনিয়ার নিয়মই এই। একটু নিন্দা করার জন্য লোকের অনুনয়ের অন্ত নেই। কিন্তু নিন্দা করবে কেবল সেইটুকু পাপের যা তারা স্বীকার করে। বাকিটুকুর জন্য কারো মাথাব্যথা থাকতে নেই। খুঁজে বের করো, রীতিমতো খেপে যাবে।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ পনেরো বছর আগে লোকে বলত আমি নাকি ছিলাম গ্রিসের সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা। আর এখন তাকিয়ে দ্যাখো! আমার যন্ত্রণাকেও বুঝতে চেষ্টা করো। বিদেশী তরুণ শোনো তাহলে খোলাখুলিই বলি। সেই কামাসক্ত মিনসের মৃত্যুতে আমার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। হাম্মামের পানি ওর রক্তে যখন লাল হয়ে উঠল তখন আমি চরম পুলকে নেচেছিলাম, গেয়েছিলাম। এই পনেরো বছর পরেও সে-কথা মনে হলে আমার গা শিউরে ওঠে। কিন্তু আমার...আমার একটি ছেলে ছিল—এখন তার বয়স তোমার মতোই হত। ইজিসথাস যখন তাঁকে ঘাতকের হাতে তুলে দিল, আমি...

ইলেকট্রা ॥ বোধ করি তোমার একটি কন্যাও ছিল মা। তাকে তুমি বাড়ির ঝি-গিরিতে বহাল করেছ। কিন্তু কৈ, সে-পাপের অনুশোচনা বিশেষ একটা আছে বলে তো মনে হয় না তোমার?

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ ইলেকট্রা, বয়সে তুই কাঁচা। কোনো অপরাধ না-করা পর্যন্ত এ-বয়সে নিন্দা করা খুবই সহজ। কিন্তু জানিস, তুইও একটা অপরাধের বোঝা টেনে নিয়ে

বেড়াবি। প্রতি পদক্ষেপেই মনে হবে বুঝিবা এই মুক্তি পেলি, কিন্তু সে-পাপের ভার একতিলও কমবে না। পেছনে তাকালেই দেখবি পায়ে পায়ে আসছে। একটা কালো স্ফটিকের মতো চক্‌চক্ করছে। সে পাপের স্বরূপ ভুলে গিয়ে নিজেই নিজেকে শুধাবি—আচ্ছা, এ-পাপ কি আমিই করেছি, সে কি আমি? লক্ষবার অস্বীকার করলেও দেখবি সে বোঝার গুরুভার বেদম টানছে পেছন থেকে। তখন বুঝবি জীবনকে বাঁধা দিয়েছিস পাশার একটিমাত্র ভ্রান্ত চালে—যেটুকু রইল তা শুধু অপরাধের ঘানিটাকে টানা, আমৃত্যু টানা। ভালো হোক, মন্দ হোক, অনুশোচনার এই হচ্ছে নিয়ম। আর তখন—হ্যাঁ, তখন দেখবি তোর নবযৌবনের এ অহঙ্কার হার মানবে।

ইলেকট্রা ॥ আমার নবযৌবনের অহঙ্কার। আচ্ছা তাহলে তোমার অনুশোচনা বিগতযৌবনের জন্য, কৃত পাপের জন্য নয়। আমার পবিত্রতাকে তুমি ঘৃণা করো, তারও চেয়ে বেশি ঘৃণা করো আমার যৌবনকে।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ ইলেকট্রা, তোর মাঝে আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি আমার এই আমিটাকে। না, না, তোর যৌবনকে নয়—তোর মাঝে আমার যৌবনকে।

ইলেকট্রা ॥ আর মা, আমি তোমাকে ঘৃণা করি—তোমাকে!

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ ছিঃ, ছিঃ, ইলেকট্রা। এ কী করছি আমরা, একই পুরুষের প্রেমাসক্ত সমবয়সী দুটি নারীর মতো ঝগড়া করছি না কি? কিন্তু তবু আমি তোর মা...। জানি না তুমি কে যুবক, জানি না কীজন্য তোমার আগমন। কিন্তু তোমার পদসঞ্চারে অমঙ্গলের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আমি। ইলেকট্রা আমায় ঘৃণা

করে, সে তো আমি জানি। কিন্তু পনেরো বছর ধরে আমরা নীরবে ছিলাম। কেবল চোখের তারায় নাচত আমাদের অনুভূতির বৈরিতা। কিন্তু এই যে তুমি এসেছ, কথা বলছ ব্যস, দ্যাখো কেমন রাস্তার কুকুরের মতো দুজনই গজরাচ্ছি, ঝগড়া করছি। আরগোসের প্রথাসিদ্ধ প্রাচীন নিয়মে, তোমাকে আপ্যায়ন করতেই হয়। কিন্তু সাফ্ সাফ্ বলেই ফেলি, তুমি বাছা চলে যাও। আর তোকে, যে তুই অবিকল আমার মতো হয়েছিস দেখতে, তোকে আমি ঘৃণা করি, সত্যিই ঘৃণা করি। আমার জীবন গেলেও তোর কোনো ক্ষতি আমি হতে দেব না, এ-কথা জানিস্ বলেই আমার এই দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছিস। কিন্তু তোর ছোট্ট বিষাক্ত ফণা তুই ইজিসথাসের বিরুদ্ধে তুলিসনে। লাঠির আঘাতে সাপের মাথা ভাঙতে সেও ভালোই জানে। ও যেমন বলে তেমন করিস—না হলে তোর কপালে দুঃখ আছে!

ইলেকট্রা ॥ রাজাকে বলে দিও আমি যাচ্ছিনে এ উৎসবে। জানো ফিলেবুস, ওরা কী করে! শহরের প্রান্তে উচ্চ মালভূমিতে একটা বিরাট গুহা আছে। এর থই কেউ পায়নি আজ পর্যন্ত—যুবক বলো, বীরযোদ্ধা বলো, কেউ না। লোকে বলে নরকে গিয়ে নাকি এর শেষ হয়েছে। প্রধান পুরোহিত এর মুখটা একটা বিরাট পাথর দিয়ে বন্ধ করে রেখেছেন। বিশ্বাস করো, প্রতিবছর উৎসবের এই দিনটিতে নগরবাসীরা এই গুহামুখের সামনে জমায়েত হয়। সৈন্যরা পাথরটা সরিয়ে দেয়। ওরা বলে আমাদের মৃতেরা নাকি নরক থেকে উঠে এসে নগরীর পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। প্রতি গৃহে ওদের খাবার দেয়া

হয় টেবিলে, বিছানা করা হয়, চেয়ার পাতা হয় আর বাড়ির লোকেরা রাতে ঘরের কোণে গুটিসুটি মেরে থাকে ওদের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য। মৃতেরা সবজায়গায় ঘুরে বেড়ায়, সারাটা শহরই ওদের দখলে। নগরবাসীরা ওদের যে কী অনুনয়ই না করে—কল্পনাও করতে পারবে না। 'ওহে মৃতাত্মা, তোমার কোনো ক্ষতি হোক এ আমি চাইনি, সদয় হও, হে প্রিয়তম।' পরদিন ভোরে ওরা পাতালে ফিরে যায়। পাথরের ঢাকনাটা গুহার মুখ ঠেলে বন্ধ করা হয়। ব্যস, পরের বছর না-আসা পর্যন্ত সেইখানেই ইতি। এ প্রহসনে অংশ নিতে আমি নারাজ। মৃতেরা ওদের আত্মীয়, আমার কেউ নয়।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ স্বেচ্ছায় না-গেলে রাজা তোকে জোর করে নেবে জানিস।

ইলেকট্রা ॥ জোর করে...বুঝতে পারছি। আচ্ছা তবে তাই হোক। পরম স্নেহময়ী মা আমার, তবে তুমি রাজাকে জানিয়ে দাও, তার আজ্ঞা পালিত হবে। উৎসবে আমি যাব। প্রজারা আমায় দেখতে চাইলে তারা নিরাশ হবে না।...ফিলেবুস তুমি একটা কাজ করবে, দয়া করে থেকো, এখনি যেও না যেন, উৎসবটা দেখেই যেও! হয়তো উৎসবের কোনো কোনো জিনিশ তোমার ভালো লাগতেও পারে। যাই দেখি, তৈরি হয়ে আসি।

[*ইলেকট্রার প্রস্থান*]

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ [*অরেস্টিসের প্রতি*] চলে যাও এখান থেকে। আমার কেবলি মনে হচ্ছে তুমি অমঙ্গল বয়ে আনছ আমাদের জন্য। আমাদের অমঙ্গল কামনা করার কোনো সঙ্গত কারণ তোমার নেই। আমরা

তোমার কিছুই করিনি। সুতরাং হে বিদেশী, যাও চলে যাও। ধর্মের দোহাই, তোমার মায়ের দোহাই—পায়ে পড়ি তুমি চলে যাও।

অরেস্টিস ॥ আমার মায়ের দোহাই...।

*[জীয়ূসের প্রবেশ]*

## ষষ্ঠ দৃশ্য

অরেস্টিস, জীয়ূস

জীয়ূস ॥ আপনার অনুচর বলছিল আজই চলে যাচ্ছেন। সারাটা শহর খোঁজ করেও সে ঘোড়া পায়নি কোথাও। তা আমি আপনাকে খুবই ন্যায্যমূল্যে দুটো সুসজ্জিত ঘোড়া দিতে পারি।

অরেস্টিস ॥ আমি কোথাও যাচ্ছিনে।

জীয়ূস ॥ *[প্রলম্বিত স্বরে]* আপনি যাচ্ছেন না। *[ক্ষণকাল পর উৎফুল্লচিত্তে]* বেশ বেশ। আমি তাহলে আপনাকে ছেড়ে যাই কী করে বলুন দেখি। আপনি আমার মেহমান। শহরের ও-প্রান্তে একটা চমৎকার সরাই আছে সেখানে আমরা সবাই থাকতে পারব। আমার সঙ্গ আপনার মন্দ লাগবে না, এ আশ্বাস দিতে পারি। কিন্তু দাঁড়ান আগে ওই মাছিগুলোর একটা বিহিত করে নেই। ছুঃ আন্তর মান্তর ছুঃ ছুঃ। দেখলেন আমার মতো প্রবীণ মানুষ আপনার মতো নবীনের কাজে লাগতে পারে কখনো কখনো। তাছাড়া আমি আপনার বাবার মতো। আপনার সব কথা আমার বলতে হবে কিন্তু।

আসুন যুবক, 'না' বলবেন না। এই ধরনের হঠাৎ দেখার বেমওকা মেওয়াও মিলতে পারে। এই টেলেমেকাসের কথাই ধরুন না—ওই-যে রাজা ইউলিসিসের পুত্র। একদিন শুভক্ষণে মেন্টার নামে একজন প্রবীণের সাথে তার দেখা হয়েছিল যিনি তাঁর বাহুবল বৃদ্ধি করেছিলেন। সেই বুড়ো মেন্টার আসলে কে সে-কথা আশা করি জানেন...

[*অরেস্টিসকে সঙ্গে নিয়ে জীয়ুসের প্রস্থান*]

## দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম পর্ব

পর্বতের উপর খানিকটা সমতল ভূমি, ডানে গুহামুখ। একটি বিরাট পাথর দিয়ে বন্ধ। বাঁয়ে মন্দিরে উঠার সিঁড়ি।

### প্রথম দৃশ্য

জনতা, জীয়ুস, অরেস্টিস এবং গৃহশিক্ষক

মহিলা ॥ [*ছেলের সামনে হাঁটুগেড়ে বসে*] আহ্ তোমার রুমালটা এই নিয়ে তিনবার বেঁধে দিলাম। [*হাত দিয়ে রুমালের ভাঁজ সোজা করে*] এই নাও। এবার বেশ ফিটফাট লাগছে। কিন্তু বাপি, লক্ষ্মী হয়ে থেকো। আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যদের সাথে কাঁদতে শুরু করবে, কেমন!

ছেলে ॥ মা, ওরা কি গুহার ভেতর থেকে আসবে?

মহিলা ॥ হ্যাঁ।

ছেলে ॥ আমার কিন্তু ভয় করছে মা!

মহিলা ॥ সেটাই চাই, তোমাকে ভয় পেতে হবে—ভীষণ ভয়। ভয়ই তো মানুষকে ধার্মিক করে, মানুষরূপে গড়ে তোলে।

লোক ১ ॥ আজকের পরিষ্কার দিনটা যাই বলো ওদের জন্য বেশ চমৎকার হবে।

লোক ২ ॥ পরম সৌভাগ্য বলতে হবে, প্রেতাত্মা হলেও রোদের প্রতি দুর্বলতা রয়ে গেছে ষোলোআনা।

গেলবার বৃষ্টি হয়েছিল মনে নেই। আর ওরা তাতে উহ্...সে কী সাংঘাতিক।

লোক ১ ॥ হুঁ সাংঘাতিকই বটে!

লোক ২ ॥ উহ্ সে কী ভয়ঙ্কর!

লোক ৩ ॥ এবার গুহায় ফিরে গেলে হয় একবার। আমি ওখানটায় উঠে ওই পাথরটার দিকে চেয়ে হাঁফ ছেড়ে আপন মনেই বলব, বাঁচা গেল আপাতত এক বছরের জন্য।

লোক ৪ ॥ তা, আমার বাপু সান্ত্বনা অত সহজে আসে না। কাল থেকে আমার ভাবনা হবে আগামী বছর ওদের গতিকটা কেমন হবে, ওদের হাবভাব চালবোল প্রতি বছরই কেমন যেন কেবলই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

লোক ২ ॥ চুপ; অমন অলুক্ষণে কথা বলতে নেই। ওদের কেউ যদি গুহার ছিদ্রপথে ইতিমধ্যেই বেরিয়ে এসে আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে থাকে। শুনেছি ওদের কেউ কেউ লগ্নের আগেই বেরিয়ে আসে। [*একে অপরের দিকে ভয়ার্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে*]

যুবতী ॥ ইস্, আর পারিনে, তাড়াতাড়ি শুরু হলে বাঁচি। রাজবাড়ির লোকগুলো যেন কী! ওদের বাপু মোটেও তাড়া নেই। এই চৈত্রের গোমট আর ঐ কালো পাথরটার দিকে তাকিয়ে থাকা—এ আর এমন কী! কিন্তু এই হাপিত্যেশ করে বসে থাকাটাই অসহ্য। উহ্ ওরা দাঁড়িয়ে আছে ওই পাথরটার ওপারে; আমাদের পীড়ন করবে এই নিষ্ঠুর পুলকে অপেক্ষা করছে। উহ্ ভাবতেই গা কেমন করে!

বৃদ্ধা ॥ হয়েছে, আর আদিখ্যেতা দেখিয়ে কাজ নেই। কী

আমার সতীসাধ্বী গো! ভয় যে কেন পেয়েছ সে যেন লোকে জানে না আর কী! সোয়ামীটা মরেছে গেল ফাল্গুনে—আবাগীর বেটা মরে জুড়িয়েছে। দশ বছর ধরে তোমার যে বাপু ভাতারের সঙ্গে ফুচুর ফাচুর হুঁ।

যুবতী ॥ সে মিছে বলোনি গো! মানুষটাকে ঠকিয়েছি, বেহুদা ঠকিয়েছি। কিন্তু জানো মানুষটাকে আমি ভালোবাসা দিয়েছি, দিয়েছি সুখ। বেঁচে থাকতে একটুও সন্দো করেনি গো। মরার সময় যদি দেখতে—চোখদুটো কেমন নীড়ভাঙা পাখির মতো ছলছল করে উঠেছিল। কিন্তু এখন সে জানতে পেরেছে। ওর সবকিছু বিষিয়ে গেছে। সে আমায় ঘৃণা করে। একটা যন্ত্রণায় সে এখন প্রতিনিয়ত পুড়ে মরছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ধোঁয়াটে দেহটা আমার দেহকে জড়িয়ে ধরবে—সাপের মতো পাকে পাকে, এমন নিবিড় নিশ্ছিদ্র আলিঙ্গন বুঝিবা কোনো মর্ত্যের মানুষের হয় না। ও আমার কণ্ঠে জড়িয়ে থাকবে সাতনরী হারের মতো, ওকে নিয়ে আমি ঘরে ফিরব, পরিবেশন করব ওর প্রিয় খাবার, তালের পিঠা, মধু আরো কত কী। কিন্তু তাতেও ওর ক্ষমাহীন জিঘাংসার ইতি নেই। আর তাছাড়া আজ রাতে উহ্, আজ রাতে ও আমার সাথে এক বিছানায় শোবে।

লোক ১ ॥ সে তো বুঝলাম। কিন্তু রাজা করছেটা কী শুনি? কী ভাবছে! আচ্ছা এভাবে এতগুলো মানুষকে দাঁড় করিয়ে রাখা—আমার বাপু মোটেও ভালো লাগছে না।

লোক ২ ॥ তা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসো না, বসো। আরে ইজিসথাস কি আমাদের চেয়ে কম ভয় পেয়েছে

নাকি? ওর জায়গায় হলে, পারতে পুরো চব্বিশটা ঘণ্টা আগামেমননের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে?

যুবতী ॥ উহ্, কী ভীষণ, কী ভয়ঙ্কর এই রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা! আমার কী মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে, আমাকে এখানে একা ফেলে রেখে তোমরা সবাই ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছ দূরে, বহুদূরে। গুহামুখের পাথরটা এখনো সরানো হয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে আমরা সবাই যেন আমাদের মৃতাত্মাদের অদৃশ্য মুঠোয় বন্দি হয়ে পড়েছি। আমরা সবাই যেন ভীষণ একাকী, শ্রাবণরাতের বৃষ্টির ফোঁটার মতো বড়ই নিঃসঙ্গ।

[জীয়ূসের প্রবেশ। সাথে অরেস্টিস ও গৃহশিক্ষক]

জীয়ূস ॥ এই, এদিকে আসুন। এখানটায় দাঁড়িয়ে দিব্যি দেখা যাবে।

অরেস্টিস ॥ এরাই তাহলে আরগোস শহরের নাগরিক! রাজা আগামেমননের অতি বিশ্বস্ত প্রজার দল!

গৃহশিক্ষক ॥ ইস্ কী নোংরা আর কুৎসিত অবয়ব ওদের। চেয়ে দেখুন হুজুর, চোখ কোটরে বসা, মুখ কেমন রক্তহীন বিবর্ণ! একটা ভীষণ আতঙ্কে যেন মৃতপ্রায়। এমনটা হয়েছে অবশ্য ঐ কুসংস্কারের ফলে। চোখ মেলে চেয়ে দেখুন হুজুর। আর তারপরও যদি বিশ্বাস না হয় আমার ভাবাদর্শগুলো অভ্রান্ত, তবে মিলিয়ে দেখুন-না, আমার উজ্জ্বল টকটকে লাল গাত্রবর্ণের সঙ্গে ওদের মুখগুলো মিলিয়ে দেখুন।

জীয়ূস ॥ তা হলই-বা উজ্জ্বল টকটকে গাত্রবর্ণ। তাতে হলটা কী শুনি। মন চায় সারামুখে একরাশ কৃষ্ণচূড়া মেখে এসো না! দেবতা জীয়ূসের চোখে তুমিও যা, ওরাও তা। একতাল গোবর, তুমিও

গোবর, ওরাও গোবর। তোমার গায়ের দুর্গন্ধে ব্রহ্মতালু জ্বলে যায়—তুমি সে-কথা জানো না। ওরা অন্তত নিজেদের পূতিগন্ধকে আপন বলে চেনে। অন্তত তোমার চেয়ে ভালো চেনে।

*[জনতা আর্তনাদ করে ওঠে। প্রথম ব্যক্তি মন্দিরের সোপানে আরোহণ করে জনতাকে উদ্দেশ করে বলে]*

লোক ১ ॥ ওরা কি আমাদের মাথা খারাপ করে দেবে নাকি? বন্ধুগণ আসুন আমরা সবাই রাজা ইজিসথাসকে ডেকে বলি, উৎসব লগ্নের এই বিলম্ব আমরা আর সহ্য করতে পারছিনে।

জনতা ॥ ইজিসথাস! রাজা ইজিসথাস! দয়া করো, দয়া করো, হে রাজন!

নারী ॥ হ্যাঁ, করুণা, করুণা করো? হায়, কেউ কি আমায় করুণা করবে না! উন্মুক্ত বিবরে সে আসবে, অদৃশ্য কদর্য বাহুর বন্ধনে আমায় বাঁধবে—সারাটা রাত কাটাবে আমার বিছানায় অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেমের দাবি নিয়ে। সারাটা রাত, উহ্! *[মূর্ছা যায়]*

অরেস্টিস ॥ এ যে দেখছি স্রেফ পাগলামি! কেউ লোকগুলোকে কেন বলে দেয় না...।

জীয়ূস ॥ কী হল যুবক। কেবল এক অবলার মূর্ছা দেখেই বিচলিত হচ্ছেন। এই তো সবে শুরু, অনেক কিছুই তো বাকি এখনো।

লোক ১ ॥ *[নতজানু হয়ে]* কী দুর্গন্ধ! আমার সর্বাঙ্গে পূতিগন্ধময় একতাল মাংস! দ্যাখো, মাছিগুলো কেমন দাঁড়কাকের মতো উড়ে এসে বসছে আমার উপর! প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হে মাছির দল—আমাকে তোমরা কুরে কুরে খাও, খুবলে নাও আমার কলজে, উপড়ে নাও! আমি সন্তপ্ত, আমি অনুতপ্ত,

আমি নর্দমার কীট—আমি অন্তহীন পাপের অতল গহ্বর।

জীয়ূস ॥ বাহ্! বাহ্! এ যে দেখছি নির্জলা সৎ লোক!

কয়েকজন ॥ [*তাকে উঠিয়ে*] হয়েছে, হয়েছে। ওরা উঠে এলে বরং তোমার কথা শুনিয়ো অনেকক্ষণ ধরে।

[*উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে তাকায় লোকটি*]

জনতা ॥ ইজিসথাস! রাজা ইজিসথাস! দোহাই তোমার! অসহ্য এ প্রতীক্ষা! এবার উৎসব শুরুর অনুমতি দাও হে রাজা!

[*মন্দিরের সোপানে ইজিসথাসের আগমন। পেছনে ক্লাইটেমনেস্ট্রা। রাজ পুরোহিত, সান্ত্রীদল*]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্বের দৃশ্য। ইজিসথাস, ক্লাইটেমনেস্ট্রা, রাজপুরোহিত ও সান্ত্রীগণ

ইজিসথাস ॥ বেজন্মার বাচ্চারা! কোন্ সাহসে বিলাপ করিস! নিজেদের কুকীর্তির কথা ভুলে গেলি এরই মধ্যে। জীয়ূসের দিব্যি দিয়ে বলছি, বাড়াবাড়ি করবি তবে মনে করিয়ে দেব। [*ক্লাইটেমনেস্ট্রার দিকে চেয়ে*] মনে হচ্ছে ইলেকট্রাকে ছাড়াই শুরু করতে হবে। কিন্তু হুঁশিয়ার করে দিও ওকে। আমার শাস্তি কিন্তু চরম হবে।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ ও তো আসবে কথা দিয়েছিল। সেজেগুজে আসতে একটু দেরি হচ্ছে এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

ইজিসথাস ॥ [*সান্ত্রীদের*] রাজপ্রাসাদের যেখানে পাও ইলেকট্রাকে খুঁজে নিয়ে এসো। প্রয়োজন হলে, জোর করে ধরে আনবে। [*সান্ত্রীদের প্রস্থান। জনতার প্রতি*] তোমাদের যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ আগের মতো, পুরুষেরা আমার ডানে আর মহিলা ও বাচ্চারা আমার বায়ে! বা, এই তো বেশ! [*নীরবতা—অপেক্ষমাণ ইজিসথাস*]

রাজপুরোহিত ॥ রাজন, জনতা কিন্তু উৎকণ্ঠা আর প্রতীক্ষার শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ইজিসথাস ॥ জানি, কিন্তু আমি অপেক্ষা করছি...
[*সান্ত্রীদের প্রত্যাবর্তন*]

সান্ত্রী ॥ মহারাজ, রাজকন্যাকে প্রাসাদের কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। আমরা তন্নতন্ন করে তালাশ করে দেখেছি হুজুর!

ইজিসথাস ॥ ও, তাহলে এই কথা! আচ্ছা ওর ব্যাপারে যথাবিহিত ব্যবস্থা আগামীকাল নেওয়া যাবে। [*পুরোহিতের প্রতি*] শুরু করুন।

রাজপুরোহিত ॥ পাথর উন্মুক্ত করো!

জনতা ॥ আহ!
[*সান্ত্রীরা পাথর সরিয়ে ফেলে। রাজপুরোহিতের গুহামুখে আগমন*]

রাজপুরোহিত ॥ হে, বিস্মৃত, পরিত্যক্ত বিদেহী আত্মারা! তোমরা, যাদের অন্তরে আশাভঙ্গের যাতনা, কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে যারা উঠে আসছ অন্ধকার গহ্বর থেকে, একরাশ লজ্জা আর কলঙ্ক ছাড়া যাদের আর কিছুই নেই—তোমরা সবাই জাগো। এই তোমাদের মাহেন্দ্রক্ষণ! একটা ভয়াল ধূম্রপুঞ্জের মতো হাওয়ায় ভর করে উঠে এসো মৃত্তিকার অতল থেকে—তোমরা যারা

সহস্রবার মরেছ, আমাদের প্রতিটি হৃদস্পন্দে যাদের প্রতিপলের মৃত্যু লেখা। অনির্বাণ ক্রোধ আর জিঘাংসার নামে আমি তোমাদের আহ্বান করছি! তোমরা উঠে এসো, তোমাদের সঞ্চিত সব ঘৃণা ছড়িয়ে দাও জীবিতদের বুকে। এসো আমাদের রাজপথে একটা অন্ধকার রাহুর মতো--মায়ের সঙ্গে সন্তানের, প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমিকের রাখি বেঁধে দাও, অঙ্গে অঙ্গে জড়াও। আমরা যে এখনো জীবিত এ সন্তাপ আমাদের অন্তরে জাগ্রত করো। উঠে এসো, ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানোব, জীন, পরী সব—আমাদের বিনিদ্র রজনীর দুঃস্বপ্নেরা তোমরা উঠে এসো! সৈনিক যারা ঈশ্বরে অবিশ্বাস রেখে মরেছে, হে কলঙ্কের সন্তানেরা, হে নিপীড়িত অসহায় আত্মারা, তোমরা সব ওঠো, তোমরা যারা ক্ষুধায় কাতর হয়ে মরেছ, শেষ নিঃশ্বাসে যাদের ছিল অভিশাপ। উঠে এসো, দ্যাখো, জীবিতেরা তোমাদের স্বাগত জানাতে এসেছে, তোমাদের ক্রোধের আগুনে দগ্ধ হতে এসেছে। একটা দুরন্ত ঘূর্ণিঝড়ের মতো উঠে এসো, ওদের দেহের মাংস কুরে কুরে খাও, ওঠো জাগ্রত হও হে মৃতাত্মারা!

*[ঢোলের শব্দ হয়। তাল মিলিয়ে গুহামুখে পুরোহিতের নৃত্য। প্রথমে ধীরে, পরে উদ্দাম ঘূর্ণনে—অবশেষে পতন। ক্লান্তিতে হাঁপাতে থাকে]*

ইজিসথাস ॥ ওরা বেরিয়ে আসছে।

জনতা ॥ উহ্ কী ভীষণ!

অরেস্টিস ॥ অসহ্য। এ আমি আর সইতে পারছি না। আমি এখানে আর থাকতে পারছি না।

জীয়ূস ॥ আমার চোখের দিকে তাকাও যুবক। হ্যাঁ, এইভাবে। বুঝতে পেরেছ। ব্যস, এবার চুপটি করে বসো।

অরেস্টিস ॥ কিন্তু আপনি কে?

জীয়ূস ॥ অচিরেই তা জানতে পারবে।

*[ইজিসথাস মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নামে]*

ইজিসথাস ॥ ওই যে ওরা! ওরা সবাই এসে গেছে। *[ক্ষণিকের নীরবতা]* অরিসি ওই যে তোমার স্বামী যার প্রতি তুমি এত অবিচার করেছ। ওর বিদেহী বাহুর বন্ধনে ও তোমায় কেমন আদরে সোহাগে জড়িয়েছে। ও তোমায় ভালোবাসে। অথচ কী অসীম ঘৃণা মিশে আছে সে প্রেমে। নিসিয়াস, এই-যে তোমার মা, তোমার অবহেলা অনাদরই যার মৃত্যুর কারণ। রক্তলোভী সেজেটেস, ওরা সবাই তোমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—ওরা যারা তোমার ঋণ শোধ না করতে পেরে আত্মহত্যা করেছে, উপোস করে মরেছে। ঋণের ভার সইতে না-পেরে খাতক ওরা সবাই তিলে তিলে মরেছে। কিন্তু আজ ওরা এসেছে মহাজন হয়ে। আর তোমরা, তোমাদের সন্তানের জনক-জননীরা, তোমাদের অপরাধী দৃষ্টি আনত করো। এই দ্যাখো, তোমাদের সন্তানেরা কেমন দুর্বল হাত বাড়িয়ে আছে—তোমাদের সকল অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতা, ওদের সকল দুঃখবোধ যার কারণ তোমরা, দ্যাখো এ সবই কেমন অসহনীয় ভার হয়ে ঝুলছে ওদের কচি অথচ ক্ষমাহীন আত্মায়।

জনতা ॥ দয়া করো।

ইজিসথাস ॥ দয়া! দয়া ভিক্ষা করছ? কেন, জানো না মৃতেরা পাষাণ, দয়ামায়াহীন। তাদের ক্ষোভ নিরেট

পাহাড়ের মতো, প্রতিহিংসা অন্তহীন। নিসিয়াস, তুমি কি আশা কর কোনো সৎকর্মের বিনিময়ে মায়ের প্রতি অবিচারের পাপ লাঘব করা যাবে। কোনো সৎকর্মই এখন আর ওর কাছে পৌঁছুবে না। ওর আত্মা এখন নিস্তরঙ্গ নিদাঘ মধ্যাহ্নের মতো, যখন কিছুই নড়ে না, কিছুই বদলায় না। সবই যখন নিস্পন্দ প্রাণহীন—বৈশাখী রৌদ্রের রুদ্রতাণ্ডব যখন পাথরে মাথা কুটে মরে। মৃতদের অস্তিত্বের ইতি হয়েছে, ভেবে দেখেছ, সে নিষ্ঠুর সত্যের কী অর্থ? হ্যাঁ, ওদের পার্থিব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে, এবং ওদের বিদেহী আত্মার অন্তহীন সঞ্চারণে তোমাদের অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই।

জনতা ॥ ক্ষমা, দয়া করো!

ইজিসথাস ॥ দয়া! হায় নির্বোধ ভাঁড়ের দল। তোমাদের আজ ঘরভর্তি লোক। লক্ষ চোখের আশাহীন দৃষ্টি তোমাদের চোখে-মুখে, সারা অঙ্গে। ওরা আমাদের দেখছে, তাকিয়ে দেখছে। মৃতদের এই জলসায় আমরা নগ্ন। হাঃ, হাঃ, তোমরা সবাই কেমন বিপর্যস্ত—ওদের সুতীক্ষ্ণ, অদৃশ্য দৃষ্টি তোমাদের দহন করছে। তোমাদের স্মৃতিতে জাগরূক চোখের মতোই যা স্থির, অপরিবর্তনীয়।

জনতা ॥ দয়া!

পুরুষেরা ॥ তোমরা যখন সত্যি মৃত, তখন আমাদের এই বেঁচে থাকার অপরাধ ক্ষমা করো।

রমণীকুল ॥ দয়া দাও! আমাদের জীবনে সর্বত্রই তোমাদের প্রীতি-উপহার, যেদিকে তাকাই শুধু তোমাদেরই দেখি। শোকের কৃষ্ণবসন আমাদের নিত্য পরিচ্ছদ, আমরা সকাল-সন্ধ্যা তোমাদের জন্য

রোদন করি। কিন্তু যে-শাস্তিই দাও-না কেন, বলতেই হয় শত চেষ্টা সত্ত্বেও তোমাদের স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে। প্রতি পলে সে-স্মৃতি ম্লানতর হয়—আর আমাদের অপরাধবোধ হয় গাঢ়তর। তোমরা হারিয়ে যাও, চলে যাও ক্ষতস্থান থেকে প্রবহমান রক্তের মতো, আমাদের জীবন থেকে, আমাদের স্মৃতি থেকে তোমরা কেবলি হারিয়ে যাও। যা হোক, এতে যদি তোমাদের ক্রোধ প্রশমিত না হয়, তাহলে জেনো, হে কায়াহীন ছায়ারা, তোমরা আমাদের জীবনকে বরবাদ করে দিয়েছ।

পুরুষেরা ॥ তোমরা যখন মৃত তখন আমাদের এই জীবিত থাকার অপরাধ ক্ষমা করো।

শিশুরা ॥ দয়া করো। আমরা তো জন্ম নিতে চাইনি। বড় হবার লজ্জায় আমরা আক্রান্ত। তোমাদের কাছে আমাদের অপরাধ? বেঁচে আছি এ অপরাধ তো আমাদের নয়। আর সে কেমন জীবন—দ্যাখো পাণ্ডুর আর ক্ষীণ আমরা। কণ্ঠ আমাদের রুদ্ধ, হাসি না, গাই না—কেবল অশরীরী আত্মার মতো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘুরে বেড়াই। আমরা তোমাদের ভয়ে ভীত। ভীষণ ভীত। দোহাই তোমাদের, দয়া করো।

পুরুষেরা ॥ তোমরা যখন মৃত তখন আমাদের জীবিত থাকার অপরাধ ক্ষমা করো।

ইজিসথাস ॥ চুপ করো! চুপ করো! তোমরাই যদি সব বিলাপ শেষ করে ফ্যাল, তাহলে আমি অর্থাৎ তোমাদের রাজার জন্য কী বাকি থাকবে। কারণ আমার অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত সমাগত—দ্যাখো, কেমন মাটি কাঁপছে, চারিদিক কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে।

মৃতশ্রেষ্ঠ আগামেমনন আসছে—আগামেমনন যাকে আমি নিজ হাতে হত্যা করেছিলাম।

অরেস্টিস ॥ [*তরবারি উন্মুক্ত করে*] সাবধান! এ ভাঁড়ামির মধ্যে আমার স্বর্গত পিতার নাম টেনে এনো না।

জীয়ূস ॥ [*ওর হাত চেপে ধরে*] দাঁড়াও যুবক, থামো।

ইজিসথাস ॥ [*ঘুরে দাঁড়িয়ে*] কার এত সাহস... [*মন্দির সোপানে শুভ্রবসনা ইলেকট্রার আবির্ভাব, তাকে দেখে*] ইলেকট্রা!

জনতা ॥ ইলেকট্রা!

## তৃতীয় দৃশ্য

একই দৃশ্য—ইলেকট্রা

ইজিসথাস ॥ ইলেকট্রা, তোমার এ শুভ্রবসনের অর্থ?

ইলেকট্রা ॥ আমার সবচে সুন্দর পোশাক পরেছি আমি। কেন, আজ না উৎসবের দিন।

রাজপুরোহিত ॥ হ্যাঁ, উৎসব, তবে মৃতদের, সে-কথা তোমার বিলক্ষণ জানা আছে। তুমি কি মৃতদের অসম্মান করতে এসেছ। কৃষ্ণবসন পরিধান করা উচিত ছিল তোমার।

ইলেকট্রা ॥ কৃষ্ণবসন! শোক! কেন আমি তো আমার মৃতদের ভয়ে ভীত নই। আর আপনাদের মৃতরা আমার কাছে অর্থহীন।

ইজিসথাস ॥ তুমি ঠিকই বলেছ ইলেকট্রা। তোমার আর আমাদের মৃতদের মধ্যে ফারাক আছে বৈকি। [*জনতাকে উদ্দেশ করে*] বেশ্যার পোশাকে সজ্জিতা

এই নারীর দিকে তাকাও। তাকাও ওর শিরায় প্রবাহিত রক্তের দিকে। আত্রিউসের দৌহিত্রী এই নারী। সেই আত্রিউস যার রক্তলোলুপ শাণিত অস্ত্র তার ভ্রাতৃ-সন্তানদের কণ্ঠকেও রেহাই দেয়নি। আজ বুঝতে পারছি ভুল করেছিলাম। দয়া করে স্থান দিয়েছিলাম প্রাসাদে। ভুলে গিয়েছিলাম আত্রিউসের কলুষিত রক্ত তোমার শিরায় বইছে। সে রক্ত চারপাশের সবকিছুকে দূষিত করবে যদি এর একটা বিহিত না করি। বেজন্মার বাচ্চা, রাজা ইজিসথাস শাস্তি দিতে জানে কিনা পরখ করে দেখবি? কেঁদে কূল পাবিনে দেখিস।

জনতা ॥ ধর্মভ্রষ্টা!

ইজিসথাস ॥ শোন্ পাতকী! কান পেতে শোন্ ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ জনতা তোকে কী নামে সম্বোধন করছে। ওদের ক্রোধকে সংযত করার জন্যে আমি যদি এখানে না-থাকতাম তবে ওরা তোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত!

জনতা ॥ ধর্মভ্রষ্টা! অপয়া!

ইলেকট্রা ॥ আনন্দের নাম কি অধর্মাচরণ? তোমরাই-বা আনন্দিত হচ্ছ না কেন! বাধাটা কোথায়?

ইজিসথাস ॥ ওর পিতা রক্তাপ্লুত মুখে ওখানে দাঁড়িয়ে, আর এই বেবুশ্যে নারী কিনা হাসছে!

ইলেকট্রা ॥ কতবড় সাহস তোমার আগামেমননের নাম উচ্চারণ করো! তুমি কী করে জানো পিতা আমার কানে কানে প্রতি রাতে কথা বলে না। সোহাগ প্রীতিতে আপ্লুত সেই ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠ আমি প্রতি রাতে শুনি। আমি হাসছি, হ্যাঁ সত্যি আমি হাসছি জীবনে এই প্রথমবারের মতো। এই প্রথম আমি সুখের হাসি হাসছি। আর আমার এ নবলব্ধ সুখে

আমার পিতার হৃদয়-যে আন্দোলিত হচ্ছে না তা তোমরা কী করে জানো? বরং তিনি যদি এখানে আসেন, তার কন্যাকে এই শুভ্রবসনে সজ্জিতা দেখেন—তার পরম আদরের কন্যা যাকে তুমি ক্রীতদাসী করে রেখেছ—যদি দেখেন তার কন্যা অহংবোধে দীপ্র, দুঃসময় তার আত্মশ্লাঘাকে ভেঙে দিতে পারেনি, তবে সম্ভবত তিনি আমাকে দোষারোপ করবেন না। ঐ চেয়ে দ্যাখো পিতার রক্তাপ্লুত যন্ত্রণাকাতর মুখে মৃদু তৃপ্তির হাসি, চোখে খুশির ঝিলিক।

যুবতী : এ কি সত্যি! ও যা বলছে এ কি সত্যি?

জনতা : না, না, ওসব বুজরুকি মিথ্যেকথা। ও পাগল হয়ে গেছে। ইলেকট্রা দয়া করে যাও এখান থেকে. তা না হলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে।

ইলেকট্রা : কিন্তু কিসের এত ভয় তোমাদের? চারিদিকে তাকিয়ে আমি তো কিছুই দেখছি না তোমাদের ছায়া ছাড়া। কিন্তু তোমরা শোনো, এইমাত্র আমি যা জেনেছি তা শোনো, হয়তো তোমরা তা জানো না। সারা গ্রিসে আরো অনেক জনপদ আছে যেখানে মানুষ পরম সুখে বসতি করছে। সুন্দর অনুপম শহর কুমিরের মতো উজ্জ্বল ওম্‌ওম্‌ রোদে গা এলিয়ে দিয়ে আছে সারাদেশে। এই মুহূর্তে এই একই আকাশের তলে করিন্থের রাজপথে ছেলেমেয়েরা মহাআনন্দে খেলছে। ওদের মায়েরা কিন্তু জন্ম দেবার অপরাধে ক্ষমা প্রার্থনা করছে না। স্মিতহাস্যে ওরা ওদের দিকে তাকিয়ে আছে—মাতৃত্বের অহঙ্কারে। হে আরগোসের মায়েরা, তোমরা কেন বুঝতে পারো না, যে মা তার

সন্তানের দিকে তাকিয়ে ভাবেন—আমিই ওকে আমার পেটে ধারণ করেছি—সে মায়ের অহঙ্কারের কি কোনোই অর্থ নেই তোমাদের কাছে!

ইজিসথাস ॥ চুপ কর। যথেষ্ট হয়েছে। চুপ কর। তা না হলে তোর ঐ বক্তৃতার সেলামি তোকে দিতে হবে।

কয়েকজন ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে চুপ করতে বলো, যথেষ্ট শুনেছি।

অপর কয়েকজন ॥ না, ওকে বলতে দাও। আগামেমনন ওর মাধ্যমে কথা বলছেন।

ইলেকট্রা ॥ তাকিয়ে দ্যাখো কী উজ্জ্বল সোনালি রোদ। সমতলে সর্বত্র লোকেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছে—আহ্ কী সুন্দর দিন। হে তোমাদের নিজ নিজ আত্মার হন্তারক, তোমরা কি সেই দেহাতী মানুষটির সহজ আনন্দবোধ থেকেও বঞ্চিত যে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে পারে, আহ্ কী সুন্দর দিন। অথচ তোমরা দাঁড়িয়ে আছ নতমস্তকে, নিস্পন্দ হাতে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে—জীবন্মৃতের মতো। তোমাদের মৃতরা তোমাদের দেহে সাপটে আছে—তোমাদের ভয় পাছে সামান্যতম অঙ্গ সঞ্চালনে তাদের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ো। তোমাদের প্রচণ্ড ভয়, পাছে তোমাদের হাত হঠাৎ কোনো ভেজা বাষ্পের গায়ে লাগে—আর তা যদি হয় তোমার বাবা কিংবা মায়ের প্রেত? কিন্তু এদিকে আমার দিকে তাকাও। এই দ্যাখো আমি কেমন দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছি, প্রসারিত করছি নিদ্রোত্থিতার মতো, দুহাত ছুড়ে আড়মোড়া ভাঙছি। সূর্যালোকে আমি আমার স্থানটুকু করে নিয়েছি। কই আমার মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়ছে না। এই দ্যাখো আমি নাচছি। আমি নাচছি। আমার গানে বাতাসের

আলতো স্পর্শ ছাড়া আমি তো আর কিছুই অনুভব করছি না। কোথায়, মৃতেরা কোথায়? তোমাদের কি মনে হচ্ছে মৃতেরা আমার সাথে তালে তালে নাচছে!

রাজপুরোহিত ॥ প্রিয় আরগোসবাসী, এই রমণী ধর্মভ্রষ্টা। আমি ওকে এবং ওর কথা যারা শুনবে তাদের অভিসম্পাত দিচ্ছি।

ইলেকট্রা ॥ হে আমার মৃতেরা—আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ইফিজিনি এবং পিতা ও রাজা আগামেমনন—তোমরা আমার প্রার্থনা শোনো। আমি যদি সত্যি ধর্মভ্রষ্টা হই, যদি তোমাদের সন্তপ্ত আত্মাকে আমি কোনো আঘাত দিয়ে থাকি—তবে কোনো সংকেত দ্বারা তা জ্ঞাপন করো। কিন্তু তোমরা যদি তৃপ্ত হয়ে থাকো তবে যেন একটি পাতাও না নড়ে, একটি ক্ষীণতম শব্দও যেন আমার নাচের তাললয় ভঙ্গ না করে। কারণ আমি আনন্দের জন্য নাচছি—মানুষের শান্তির জন্য নাচছি, সুখের জন্য নাচছি, আমি জীবনের জন্য নাচছি। হে আমার মৃতেরা, তোমরা নীরব থাকো, এই আমার মিনতি যাতে এরা সবাই জানতে পারে তোমরা আমার সাথে আছ।

[*ইলেকট্রার নৃত্য*]

জনতার কয়েকজন ॥ ও নাচছে। দ্যাখো ও কেমন নাচছে আগুনের শিখার মতো, হালকা রৌদ্রালোকে পাখির পালকের শব্দের মতো, অথচ কী আশ্চর্য, মৃতেরা নিশ্চুপ।

যুবতী ॥ দ্যাখো ওর চোখে-মুখে কী স্বর্গীয় দীপ্তি। না, না এ কোনো ধর্মভ্রষ্টার মুখাকৃতি হতে পারে না।

ইজিসথাস, রাজন তুমি নীরব কেন। বলো জবাব দাও।

ইজিসথাস ॥ ইতর পশুর সঙ্গে মানুষ কি তর্ক করে? ইতর প্রাণীকে মানুষ ধ্বংস করে। অতীতে ওর প্রতি সদয় ব্যবহার করে ভুল করেছি। তাই বলে ভুল সংশোধনের সময় বিগত হয়নি। ভয় পেও না, আমি ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব। আর সেইসঙ্গে শেষ হবে ওর অভিশপ্ত বংশেরও।

জনতা ॥ জবাব দাও, রাজন জবাব দাও। ভ্রূকুটিতে প্রশ্নের জবাব হয় না মহারাজ!

যুবতী ॥ ও পরম সুখে নাচছে, হাসছে। আর মনে হচ্ছে মৃতরা ওকে সযত্নে রক্ষা করছে। আহ্ ভাগ্যবতী ইলেকট্রা। দ্যাখো আমি কেমন বাহু প্রসারিত করেছি, আমার গ্রীবা উন্মুক্ত করে দিয়েছি রৌদ্রে।

জনতার একজন ॥ মৃতেরা নীরব নিস্তব্ধ। ইজিসথাস, তুমি মিথ্যে বলেছ আমাদের সঙ্গে।

অরেস্টিস ॥ প্রিয় ইলেকট্রা।

জীয়ূস ॥ ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি আমি এই নির্বোধ রমণীর জিভ কেটে নেব। [*হাত প্রসারিত করে*] পসাইডন। আন্তর মান্তর ছুঃ।

[*গুহামুখের শিলাখণ্ডটি বিকট শব্দে গড়িয়ে গিয়ে মন্দির সোপানে ধাক্কা খায়। ইলেকট্রার নাচ থামে*]

জনতা ॥ উহ্ কী ভয়াল!

রাজপুরোহিত ॥ হে অভিশপ্ত চঞ্চলমতি লোকেরা। এই হল মৃতদের প্রতিশোধ। দ্যাখো মাছিরা কেমন ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের উপর নেমে আসছে। তোমরা ঐ ভ্রষ্টার কথা শুনেছ তাই এ অভিশাপ।

জনতা ॥ আমরা তো কিছুই করিনি। আমাদের কী দোষ। ওই তো আসলে ওর বিষাক্ত কথায় আমাদের

প্রলুব্ধ করেছে। এ মায়াবিনী, কুহকিনীকে জলে চুবিয়ে মারো, চিতায় পুড়িয়ে মারো।

বৃদ্ধা ॥ [*যুবতীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে*] এই ধুমসি মাগী ওর কথা কেমন মধুর মতো চেটেপুটে খাচ্ছিল। হারামজাদীর পাছার কাপড় খুলে বেতিয়ে লাল করে দাও।

[*রমণীরা যুবতীকে ধরে। পুরুষেরা মন্দির সোপান বেয়ে ইলেকট্রার দিকে অগ্রসর হয়*]

ইজিসথাস ॥ চুপ কর্ কুত্তার দল। যার যার জায়গায় যা। শাস্তি যা দেবার আমি দেব ওকে। [*থেমে*] দেখলে তো, হুকুম অমান্য করলে পরিণাম কী হয়। রাজার কথায় আশা করি কোনো সন্দেহ নেই। এবার ঘরে ফিরে যাও। মৃতরা তোমাদের সঙ্গে যাবে। সারাদিন, সারারাত ওরা তোমাদের অতিথি। ওদের জন্য জায়গা রেখো—খাবার, হৃদয়ের উত্তাপ আর বিছানা সবই তৈরি রেখো! দেখো যেন তোমাদের উষ্ণ আতিথ্য তাদের মন থেকে এই অপ্রীতিকর ঘটনার স্মৃতি একেবারে মুছে দেয়। আর আমি—আমি যদিও তোমাদের সন্দেহে মর্মাহত, তবু আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিচ্ছি। কিন্তু ইলেকট্রা তুমি...

ইলেকট্রা ॥ আমি, আমার আর কী! এবার নাহয় ব্যর্থ হলাম। দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হব না আশা করি।

ইজিসথাস ॥ সে-সুযোগ আমি তোকে দেব না। দেশের আইনে মৃতদের এই উৎসবে শাস্তি দেবার বিধান নেই। এ তুমি জানতে, জেনেই সুযোগটা নিয়েছ। কিন্তু এখন তো তুমি আর আমাদের কেউ নও। তুমি এখান থেকে চলে যাবে নগ্নপদে, খালিহাতে, এক কাপড়ে ঐ বেবুশ্যের বেহায়া পোশাক পরে। আমার আদেশ, আগামীকাল সূর্যোদয়ের পরে

তোমাকে যেই দেখবে সে যেন দেশদ্রোহী জেনে তৎক্ষণাৎ তোমাকে হত্যা করে।

[*রাজার প্রস্থান, সান্ত্রীদের অনুগমন। জনতা ইলেকট্রাকে মুষ্টি দেখাতে দেখাতে বেরিয়ে যায়*]

জীয়ূস ॥ [*অরেস্টিসের প্রতি*] বলুন জনাব, আপনার কতটা জ্ঞান লাভ হল! এ-গল্পের একটা নীতিবাক্য আছে, অবশ্য আমার যদি খুব বড় রকমের কোনো ভুল না হয়ে থাকে। সৎলোক চিরকাল পুরস্কৃত হয়— অসত্যের শাস্তি অনিবার্য!

[*ইলেকট্রার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে*] ঐ নির্বোধ রমণীর...

অরেস্টিস ॥ [*তাৎক্ষণিকভাবে*] হুঁশিয়ার! ঐ রমণী আমার বোন। এখন এসো, আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।

জীয়ূস ॥ [কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে] বেশ!

[*জীয়ূসের প্রস্থান, গৃহশিক্ষকের অনুগমন*]

## চতুর্থ দৃশ্য

ইলেকট্রা মন্দির-সোপানে দাঁড়িয়ে। অরেস্টিস।

অরেস্টিস ॥ ইলেকট্রা!

ইলেকট্রা ॥ [*মুখ তুলে তাকিয়ে*] আহ্ এ যে দেখছি তুমি ফিলেবুস!

অরেস্টিস ॥ এই শহরে আর এক মুহূর্ত নয় ইলেকট্রা। তোমার চরম বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

ইলেকট্রা ॥ বিপদ! সে অবশ্য সত্যি! তুমি তো দেখেছ আমি কীভাবে ব্যর্থ হলাম। এতে অবশ্য তোমারও দোষ আছে খানিকটা! কিন্তু তা বলে আমি তোমার ওপর রাগ করিনি।

অরেস্টিস ॥ আমার দোষ! সে কেমন?

ইলেকট্রা ॥ তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ। [*মন্দির সোপান বেয়ে কয়েক ধাপ নেমে আসে*] দেখি আমার চোখের দিকে তাকাও! হ্যাঁ, তোমার ঐ চোখদুটিই আমার সর্বনাশ করল।

অরেস্টিস ॥ নষ্ট করার মতো সময় কোথায় ইলেকট্রা, চলো আমরা পালাই। একজন আমার জন্য একটা ঘোড়া জোগাড় করেছে, চলো তুমি আমার সঙ্গে সওয়ার হবে।

ইলেকট্রা ॥ না।

অরেস্টিস ॥ মানে! তুমি আমার সঙ্গে যাবে না!

ইলেকট্রা ॥ আমি পালাতে চাইনে!

অরেস্টিস ॥ আমি তোমায় করিন্থে নিয়ে যাব, চলো।

ইলেকট্রা ॥ [*হেসে*] করিন্থে নিয়ে যাবে, না! বুঝলে, সজ্ঞানে হয়তো নয়, কিন্তু তুমি আমায় আবার বোকা বানাতে চাইছ। করিন্থে আমার করণীয় কী আছে? আমার মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এই গতকালও আমার আশাগুলো কত সহজ ছিল, অনাড়ম্বর ছিল। টেবিলে খাবার পরিবেশন করার সময় আমি ওদের দিকে তাকিয়ে দেখতাম—হেমকান্তি বৃদ্ধার মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের দিকে, দেখতাম রাজার মাংসল মুখের আকর্ণবিস্তৃত কালো দাড়ি যেন একদঙ্গল মাকড়সার দাপাদাপি। আর স্বপ্ন দেখতাম একদিন ওদের অস্ত্রের আঘাতে বিদীর্ণ উদর থেকে ধোঁয়া উঠছে, পৌষের সকালে মুখনিঃসৃত প্রশ্বাসের মতো। ফিলেবুস, আমি এই স্বপ্নটুকু আঁকড়ে ধরেই বেঁচে আছি। তোমার মতলব কী জানিনে, কিন্তু আমি এটুকু নিঃসন্দেহে জানি, তোমাকে বিশ্বাস করা আমার উচিত নয়। তোমার চোখে

আমি সর্বনাশের ছায়া দেখতে পাই। জানো, তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে আমি কী ভাবতাম? ভাবতাম, বিশ্বাস করতাম, যে-কোনো বঞ্চনারই নির্মম প্রতিশোধ নেয়া উচিত। যে-কোনো বিজ্ঞজনেরই তা করা উচিত।

অরেস্টিস ॥ ইলেকট্রা, আমার সাথে যদি আসো, দেখবে এই প্রজ্ঞা বিসর্জন না দিয়েও, জীবনের কাছে আমাদের অনেক, অনেক কিছু চাইবার আছে।

ইলেকট্রা ॥ না, না, আমি তোমার কথা আর শুনতে চাইনে, যথেষ্ট ক্ষতি তুমি ইতিমধ্যে করেছ আমার। তোমার ঐ কমনীয় মেয়েলি মুখে ক্ষুধার্ত দুটি চোখ নিয়ে তুমি এসেছ। আমার সমস্ত ঘৃণাকে তুমি মন থেকে মুছে ফেলেছ। আমি আমার দুবাহু বাড়িয়ে দিয়েছি। আমার হৃদয়ের একমাত্র সম্পদ, আমার পরম কাঙ্ক্ষিত আর্তি ধুলায় লুটিয়েছে। আর তার ফল কী হল, সে তো তুমি নিজেই দেখেছ! আমি আমার কথার মন্ত্রে ওদের আরোগ্য করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা ওদের ব্যাধিকে ভালোবাসে। ওদের একটা ক্ষতস্থানের প্রয়োজন, আর সে-ক্ষতকে ওরা নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে কাঁচা রাখতে চায় চিরদিন। রক্তপাত ছাড়া ওদের ঐ ঘা শুকোবে না। কারণ একটা অন্যায় কেবল অন্যায় দিয়েই উৎখাত করা সম্ভব। অতএব বিদায় ফিলেবুস, যাও, আমাকে আমার দুঃস্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে দাও।

অরেস্টিস ॥ ওরা তোমায় হত্যা করবে।

ইলেকট্রা ॥ নিরাপদ আশ্রয় একটা আছে সূর্যদেবের মন্দির। খুনি আসামিরা অনেক সময় এখানে এসে লুকোয়। মন্দিরে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কেউ তাদের

কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না। আমি ওখানেই আশ্রয় নেব।

অরেস্টিস ॥ কিন্তু আমার সাহায্য চাইছ না কেন?

ইলেকট্রা ॥ তুমি আমায় সাহায্য করতে পারবে না। আরেকজন আসবে আমায় উদ্ধার করতে। [*নীরবতা*] আমি নিশ্চিত আমার ভাই বেঁচে আছে। আমি ওরই প্রতীক্ষায় আছি।

অরেস্টিস ॥ সে যদি না আসে।

ইলেকট্রা ॥ সে আসবে, আলবত আসবে। তাকে আসতেই হবে। ও আমাদের বংশের ছেলে। আত্রিউসের ধিক্কৃত কালো রক্ত বইছে ওর শিরায়—আমার মতোই ওর রক্তেও আছে অপরাধ আর বুকভাঙা দুঃখ। জানো, আমি ওকে কল্পনায় দেখতে পাই—দীর্ঘদেহী, সবল, সুঠাম, পিতার মতোই রক্তচক্ষু—একেবারে জাত যোদ্ধা। ওরও কিন্তু সর্বনাশ অনিবার্য। নিয়তির জালে জড়িয়ে গেছে ও—একটা পেটকাটা ঘোড়ার পা যেমন অন্ত্রনালির প্যাঁচে জড়িয়ে যায় তেমনি—প্রতিটি পদক্ষেপেই আঁতে পড়বে টান, ফলে সমস্ত উদর আসবে বেরিয়ে। হ্যাঁ, একদিন ওকে আসতেই হবে। এ শহর ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কারণ এখানেই সে হানতে পারে চরম আঘাত আর পরিণামে সইতে পারে চরম যন্ত্রণা। আমি প্রায়ই তাকে আসতে দেখি, নতমস্তকে, বিবর্ণ যন্ত্রণায় সক্রোধ স্বগতোক্তির ঔদ্ধত্যে। ওকে দেখে ভয় পাই। প্রতি রাতে আমি ওকে স্বপ্নে দেখি, প্রতি রাতেই দারুণ ত্রাসে চিৎকার করে আমার ঘুম ভাঙে। কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসি। আমি ওর প্রতীক্ষায় জাগি। আমায় এখানে থাকতেই হবে।

কারণ, নির্বোধ তো আমি নই, আমাকে অবশ্যই দেখিয়ে দিতে হবে খুনিদের—বলতে হবে—ওই যে ওরা, আঘাত করো, অরেস্টিস আঘাত করো।

অরেস্টিস ॥ কিন্তু ধরো, সে যদি তোমার কল্পনার মতোন না হয়ে থাকে?

ইলেকট্রা ॥ বারে, আগামেমনন আর ক্লাইটেমনেস্ট্রার সন্তান—সে আর কীরকম হবে?

অরেস্টিস ॥ কিন্তু এই রক্তপাত আর হীন ষড়যন্ত্রের কথা শুনে তার বিরক্তিও ধরতে পারে, সে যদি একটা সুন্দর নিরুদ্বেগ শহরে মানুষ হয়ে থাকে।

ইলেকট্রা ॥ তাহলে আমি ওর মুখে থুতু দিয়ে বলব : কুত্তা, যা তুই ফিরে যা, তুই একটা আস্ত মেয়েমানুষ, ওই মেয়েদের আঁচলের নিচেই তোর সর্বোত্তম স্থান। কিন্তু হিশেবে তোর ভুল হচ্ছে—আত্রিউসের দৌহিত্র তুই—রক্তের স্বাভাবিক গতিকে অস্বীকার করতে পারবিনে। খুনের বদলে তুই লজ্জাকে বেছে নিয়েছিস স্বেচ্ছায়। কিন্তু নিয়তি তোকে খুঁজে নেবেই নেবে। লজ্জা চেয়েছিস, লজ্জা তোর ভূষণ হবে ঠিকই। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও খুন তোকে করতেই হবে।

অরেস্টিস ॥ ইলেকট্রা; আমিই অরেস্টিস।

ইলেকট্রা ॥ [*আর্তচিৎকারে*] না এ হতে পারে না। না, না, এ মিথ্যা!

অরেস্টিস ॥ আমার পিতা আগমেমননের মৃত আত্মার শপথ করে বলছি, আমিই অরেস্টিস। [*নীরব থেকে*] কী হল, তোমার প্রতিজ্ঞামতো এবার আমার মুখে ঘৃণায় থুতু দিচ্ছ না কেন?

ইলেকট্রা ॥ কেমন করে তা করব। [*ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে*] এই সুন্দর মুখাবয়ব আর এই

উজ্জ্বল চোখদুটি আমার ভাইয়ের। উহ্! অরেস্টিস, তুমি কেন ফিলেবুস থেকে গেলে না। আমার ভাইয়ের কেন মৃত্যু হল না। [*ঈষৎ লজ্জায়*] করিন্থের যে-গল্প করেছ সে কি সব সত্যি!

অরেস্টিস ॥ না, এথেন্সের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে মানুষ হয়েছি আমি।

ইলেকট্রা ॥ তোমার কচি ডাগর মুখখানি বেশ। আচ্ছা তুমি কি কখনো যুদ্ধে গেছ। তোমার তরবারি কি কারো রক্তে রাঙা হয়েছে?

অরেস্টিস ॥ না, কখনো না!

ইলেকট্রা ॥ তোমার সাথে পরিচয় হবার আগে একাকীত্বের বোঝাটা হালকা ছিল। আমি আমার কল্পনার অরেস্টিসের প্রতীক্ষায় ছিলাম। কেবল ভাবতাম ওর শৌর্যবীর্য আর আমার দুর্বলতার কথা। সেই অরেস্টিস এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তোমার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে আমরা যেন দুটি পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকা। কিন্তু তুমি তো জানো আমি তোমায় ভালোবাসি, আমার কল্পনার অরেস্টিসের চাইতেও বেশি ভালোবাসি।

অরেস্টিস ॥ তবে দেরি কেন! চলো একসঙ্গে পালাই!

ইলেকট্রা ॥ পালাব! তোমার সঙ্গে! না, এ বংশের নিয়তির অন্তিম খেলা এখানেই হবে। আর আমি এ বংশেরই একজন। আমি তোমার কাছে আর কিছু চাইনে—ফিলেবুসের কাছে আমার আর কিছুই চাইবার নেই—কেবল আমায় এখানে থাকতে দাও! [*জীয়ুসের প্রবেশ। মঞ্চের পশ্চাতে লুকিয়ে ওদের কথা শোনে*]

অরেস্টিস ॥ ইলেকট্রা, আমি অরেস্টিস, তোমার অনুজ। আমিও এ-বংশেরই একজন। আমার স্থান তোমার পাশে।

ইলেকট্রা ॥ না, তুমি আমার ভাই নও! আমি তোমায় চিনি না। অরেস্টিসের মৃত্যু হয়েছে। ওর জন্য ভালোই হয়েছে সেটা। এখন থেকে পিতা এবং ভগ্নীর মৃতাত্মার সঙ্গে ওরও মৃতাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব। কিন্তু যে-তুমি আজ আত্রিউসের বংশের দাবিদার হয়ে এসেছ, তোমার কী অধিকার আছে আমাদের একজন বলে দাবি করার? মৃত্যুর কালো ছায়া তো তোমার জীবনকে স্পর্শ করেনি—তুমি ছিলে আদরে সোহাগে লালিত, আত্মবিশ্বাসে দীপ্র একটি শান্ত শিশু, তোমার পালক পিতার গর্বের ধন। স্বভাবতই মানুষের উপর তুমি আস্থা হারাওনি, কারণ মানুষও তোমার দিকে চেয়ে প্রত্যয়ের হাসি হেসেছে। চেয়ার, টেবিল, শয্যা, ইত্যাকার জড়বস্তুতে তুমি আস্থা হারাওনি। কারণ এগুলো মানুষের বিশ্বস্ত অনুচর। জীবনে তুমি আস্থা হারাওনি, কারণ তুমি লালিত হয়েছ ঐশ্বর্যের কোলে। জীবনকে তোমার কাছে নিশ্চয়ই মনে হয়েছে একটা উষ্ণ কোমল হামাম বলে যেখানে মানুষ পরম তৃপ্তিতে হাত-পা ছুড়তে পারে। আমার শৈশব কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। ছয় বছর বয়স থেকেই আমাকে খাটতে হয়েছে একজন সাধারণ ঝিয়ের মতো। সবকিছুতেই আমার তাই অবিশ্বাস। [*খানিক থেমে*] অতএব, হে কল্পচারী, যাও, চলে যাও। আমার একজন দোসর চাই, খুনের দোসর। কোনো কল্পনাবিলাসীর প্রয়োজন নেই আমার!

অরেস্টিস ॥ তোমাকে এখানে একা রেখে যাব একথা ভাবতে পারো তুমি? তোমার শেষ আশাটুকু পর্যন্ত লুপ্ত হয়েছে, কী করবে তুমি এখানে থেকে?

ইলেকট্রা ॥ সে আমি বুঝব! বিদায় ফিলেবুস!

অরেস্টিস ॥ তাহলে তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ! [*কয়েক পা এগিয়ে থামে, তারপর ইলেকট্রার মুখোমুখি*] আমি-যে তোমার কল্পনার দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হতে পারিনি সে দোষ কি আমার! ওকে পেলে তুমি ওর হাত ধরে বলতে 'আঘাত করো'। অথচ তুমি আমার কাছে কিছুই চাইছ না। হে ঈশ্বর। আমি কি এমনই হতভাগ্য যে আমার ভগ্নী আমাকে পরখ না-করেই আমায় প্রত্যাখ্যান করছে!

ইলেকট্রা ॥ তোমার ঐ শুভ্র ঘৃণাহীন হৃদয়ের ওপর এমন দুঃসহ বোঝা আমি চাপাতে চাইনে, ফিলেবুস!

অরেস্টিস ॥ চমৎকার বলেছ, ঘৃণাহীন হৃদয়! কিন্তু সে তো প্রেমহীনও বটে! তোমায় আমি ভালোবাসতে পারতাম, হ্যাঁ পারতাম...কিন্তু না, প্রেম কিংবা ঘৃণা এর জন্য চাই আত্মাহুতির! ধনাঢ্য, যৌবনদীপ্ত যে-মানুষটি তার সম্পন্ন অস্তিত্বের মাঝখানে সুপ্রতিষ্ঠিত, সে তার প্রেমের কাছে, কিংবা তার ঘৃণার কাছে আত্মদান করবে—তার জমিজিরেত, তার ঘরবাড়ি সুখস্বপ্ন এসবের মাঝে আত্মলীন হবে, এই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু আমি, আমি কে? কী আমার দেবার আছে? এরই নাম কি জীবন? আজ এ শহরের অন্ধকারে সঞ্চরমাণ অসংখ্য প্রেতাত্মার কেউই আমার মতো এমন অভিশপ্ত, ভৌতিক নয়। আমি যে ভালোবাসা পেয়েছি তার সবটুকুই প্রেতাত্মার ভালোবাসা—বাষ্পের মতোই অস্থির কম্পমান। জীবিতের সরস প্রেম আমাকে স্পর্শ করেনি কখনো। [*থেমে*] কী লজ্জা! কী লজ্জা! আমারই জন্মভূমিতে ফিরে এলাম, অথচ আমারই সহোদরা, সে কিনা

আমায় অস্বীকার করে? কিন্তু এখন আমি কোথায় যাই! কোন্ পথে!

ইলেকট্রা ॥ তোমার জন্য কোনো সুন্দরী কি কোথাও অপেক্ষা করে নেই?

অরেস্টিস ॥ না, কেউ কোথাও নেই আমার প্রতীক্ষায়। নগর থেকে নগরে আমার অন্তহীন পরিক্রমা। আমি এক আগন্তুক, অন্যের কাছে যেমন, নিজের কাছেও তেমনি। নগরীর দুয়ার আমার পেছনে বন্ধ হয় নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের মতো। আজ যদি আরগোস ছেড়ে চলে যাই, আমার আগমনের চিহ্ন কি থাকবে কোথাও লেগে—অবশ্য তোমার মনে আশাভঙ্গের বেদনাটুকু ছাড়া।

ইলেকট্রা ॥ কিন্তু তুমি যে আশ্চর্য সব সুখী জনপদের গল্প করছিলে...

অরেস্টিস ॥ সুখ দিয়ে আমার কী হবে! আমি মাতৃভূমিতে আমার পাওনাটুকু চাই। চাই সুখস্মৃতি, চাই শ্যামল মাটি, চাই মানুষের অন্তরে ঠাঁই। [*থেমে*] ইলেকট্রা, আমি আরগোস ছেড়ে যাব না।

ইলেকট্রা ॥ ফিলেবুস, দোহাই তোমার, দুটি পায়ে পড়ি, পালাও এখান থেকে। আমায় যদি ভালোবাসো, তবে যাও। এখানে তোমার অমঙ্গল অনিবার্য সে-কথা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন। আর তাছাড়া তোমার ওই নিষ্পাপ শুভ্রশুচিতা আমার সকল মতলব নস্যাৎ করে দেবে।

অরেস্টিস ॥ আমি এখান থেকে কোথাও যাব না!

ইলেকট্রা ॥ তোমার কি মনে হয় আমি তোমাকে আমার পাশে থাকতে দেব! তোমার ঐ একগুঁয়ে ভালোমানুষি নিয়ে তুমি ওখানে চুপ করে আমার কর্মকাণ্ডের বিচার করবে সেটি হচ্ছে না। আচ্ছা

তুমি এমন একগুঁয়ে কেন? তোমাকে এখানে কেউ চায় না।

অরেস্টিস ॥ এ-আমার একমাত্র সুযোগ, ইলেকট্রা—আর নিশ্চয়ই এ সুযোগ থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করবে না। বুঝতে চেষ্টা করো। আমি এমন একজন মানুষ হতে চাই যার একটা নিকেত আছে, তার বন্ধুদের মাঝে যে বেঁচে আছে। এই-যে ক্রীতদাস—বোঝার ভারে মাথাটা যার নুয়ে পড়েছে অসীম ক্লান্তিতে, যে তাকিয়ে আছে তার সামনে মাটির দিকে—ঐ ক্রীতদাসও সদম্ভে বলতে পারে, সে তার আপন শহরেই আছে—যেমন বৃক্ষ থাকে বনে কিংবা হরিৎ পত্রাবলি বৃক্ষে। আরগোস তাকে সোহাগে আদরে উত্তাপে ঘিরে আছে। হ্যাঁ, ইলেকট্রা আমি সানন্দে ঐ ক্রীতদাস হব, একটা গরম কম্বলের মতো শহরটাকে আমার সারা অঙ্গে জড়াবার পুলককে আমি আমার সত্তায় অনুভব করব। না, আমি যাব না।

ইলেকট্রা ॥ এখানে একশো বছর থাকলেও তুমি আগন্তুকই থেকে যাবে। পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর একাকীত্বের চাইতেও নিঃসঙ্গ বোধ করবে তুমি এখানে। শহরের লোকেরা চিরদিন তোমার দিকে আড়চোখে তাকাবে—তোমাকে দেখলে চাপা স্বরে কথা বলবে।

অরেস্টিস ॥ তোমাদের মাঝে ক্ষুদ্র একটু স্থান করে নেওয়া—সেকি এতই কঠিন! আমার অস্ত্র শহরের নিরাপত্তার অতন্দ্র রক্ষক হতে পারে। আমার সম্পদ তোমাদের গরিব দুঃখীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারে।

ইলেকট্রা ॥ আমাদের যোদ্ধা কিংবা দানশীল ব্যক্তি কোনোটারই অভাব নেই।

অরেস্টিস ॥ সেক্ষেত্রে... *[নত চোখে কয়েক পা দূরে যায়, জীয়ূস ওর দিকে তাকায়। অরেস্টিস আকাশের দিকে তাকিয়ে]* আহ! এর বিন্দুমাত্রও যদি দেখতে পেতাম। হে জীয়ূস, হে আকাশের অধীশ্বর, তোমাকে জীবনে কখনো স্মরণ করেছি বলে মনে হয় না। তুমিও অনুগ্রহ দিয়ে দয়া দিয়ে ধন্য করোনি আমায়। কিন্তু তুমি এইটুকু জানো আমি আমার সমস্ত কাজে নিষ্ঠাবান ছিলাম। কিন্তু আমি এখন ক্লান্ত, আমার মনে এখন একরাশ অন্ধকার। ন্যায়-অন্যায়ের তারতম্য এখন আর বুঝিনে আমি। আমার এখন একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। বলো, জীয়ূস বলো! রাজার ছেলে তার আপন রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে নতমস্তকে নির্বাসনকে স্বীকার করে নেবে, আপন পিতার গৃহ থেকে বেত্রাহত কুকুরের মতো বেরিয়ে যাবে? আমি আর ভাবতে পারি না। কিন্তু তবু—তবু—তুমি রক্তপাত নিষিদ্ধ করেছ। হ্যাঁ, আমি কী বললাম—রক্তপাতের কথা কে বলল? হে জীয়ূস, বশ্যতাই যদি তোমার কাম্য হয়, নতমস্তক আর আত্মার দীনতাই যদি তুমি চাও, তবে তোমার সে ইচ্ছা কোনো সংকেত দিয়ে প্রকাশ করো। কারণ আমি আর বুঝতে পারছি না কোন্ পথে যাব!

জীয়ূস ॥ [স্বগতোক্তি] আহ্, এই মোক্ষম মুহূর্তেই তো তোমায় সাহায্য করতে পারি বন্ধু! আন্তর মান্তর ছুঃ ছুঃ!

[পাথরের ওপর আলোর ঝলকানি]

ইলেকট্রা ॥ *[হেসে]* চমৎকার! আজ দেখছি কেরামতি ঝরছে আকাশ ফুঁড়ে। ঐ দ্যাখো ন্যায়নিষ্ঠা আর ঈশ্বরের পরামর্শ চাইবার পরিণাম। *[প্রবল হাসি। পেটে খিল ধরার অবস্থা। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে]* হে

মহৎ যুবক, দেবতাদের প্রিয়পাত্র হে ফিলেবুস। তুমি কেরামতি প্রার্থনা করেছিলে তা কেরামতি তো দেখলে—ঐ পবিত্র পাথরের চারপাশে আগুনের চকমকি তো দেখলে। এবার করিন্থে যাও। পালাও!

অরেস্টিস ঃ *[পাথরের দিকে তাকিয়ে]* তাহলে এইটেই অভিপ্রায়। শান্তিতে থাকা...সবসময় শান্তিতে থাকা। হুঁ, সবসময় মাফ করবেন আর ধন্যবাদ বলা। ওই তাহলে কাম্য, হ্যাঁ। *[নীরবে কঠোর দৃষ্টিতে পাথরের দিকে তাকিয়ে]* কিন্তু ঐ অভিপ্রায় তো তাদের অভিপ্রায়—দেবতাদের অভিপ্রায়। *[চুপ থেকে]* ইলেকট্রা!

ইলেকট্রা ঃ শিগগির যাও, পালাও। তোমার—ওই বৃদ্ধ বন্ধুটি যিনি অলিম্পাস পর্বত থেকে নেমে এসেছেন তোমাকে জ্ঞানদানের জন্য, তাকে নিরাশ কোরো না। *[হঠাৎ থামে, ওর মুখে একটা অলৌকিক দীপ্তি দেখে]* কিন্তু ও কী! কী হল তোমার?

অরেস্টিস ঃ *[ধীর অথচ কঠিন কণ্ঠে]* পথ আর একটা আছে ইলেকট্রা!

ইলেকট্রা ঃ *[ভীত স্বরে]* না, ফিলেবুস, একগুঁয়েমি কোরো না! তুমিই দেবতাদের আদেশ যাচ্ঞা করেছ—অমান্য করার পরিণাম তো ভালো করেই জানো তুমি!

অরেস্টিস ঃ আদেশ, কিসের আদেশ! হ্যাঁ, এই পাথরের চারপাশে আগুনের চকমকির কথা বলছ! ওই আলোর ঝলকানি আমার জন্য নয়। কেউ আর এখন আমায় আদেশ করতে পারবে না।

ইলেকট্রা ঃ তোমার কথাগুলো অমন হেয়ালির মতো শোনাচ্ছে কেন?

অরেস্টিস ॥ চারপাশে সবকিছু কেমন আশ্চর্যরকম বদলে গেছে! মনে হচ্ছে তুমি কতদূরে চলে গেছ। কিছুক্ষণ আগেও আমার চারপাশে জীবনের যা ছিল সজীব জীবন্ত, এইমাত্র তার মৃত্যু হয়েছে। চারদিকে এ কেমন শূন্যতা—যতদূর চোখ যায়—কী ভীষণ শূন্যতা। *[কয়েক পা এগিয়ে]* চারপাশে অন্ধকার নামছে—তুমি বুঝতে পারছ না যে চারপাশে শীত নামছে...কিন্তু কিসের, কিসের মৃত্যু হল এইমাত্র!

ইলেকট্রা ॥ ফিলেবুস!

অরেস্টিস ॥ আমি তো বলেছি পথ আর-একটা আছে...সে-পথ আমার পথ। তুমি তা দেখতে পাবে না। সে-পথের শুরু এখানে কিন্তু নামতে নামতে শেষ হয়েছে ঐ শহরে। এই পথ দিয়ে আমাকে নামতে হবে, বুঝলে, নেমে যেতে হবে তোমাদের ঠিক মাঝখানে—যেতে হবে সেই গহ্বরে যেখানে তোমরা সবাই রয়েছ। *[ইলেকট্রার দিকে এগিয়ে]* তুমি আমার বোন, আর এ শহর আমার শহর। *[ইলেকট্রার হাত ধরে]* আমার বোন!

ইলেকট্রা ॥ না, আমাকে স্পর্শ কোরো না, উহ তুমি আমায় ব্যথা দিচ্ছ, তোমাকে দেখে আমার ভয় করছে, তুমি আমার কেউ নও!

অরেস্টিস ॥ সে আমি জানি! কিন্তু বল, আমি এখনো...এখনো খুব হাল্‌কা। এমন একটা ভারী অপরাধের বোঝা আমাকে নিতে হবে যার ভার আমাকে আরগোসের ঐ অতল গহ্বরে একেবারে সটান পৌঁছে দেবে।

ইলেকট্রা ॥ কী করতে চাও তুমি?

অরেস্টিস ॥ দাঁড়াও। তার আগে আমাকে একটিবার বিদায় নিতে দাও সেই চঞ্চলতার কাছ থেকে যা ছিল

একান্ত আমার। বিদায় নিতে দাও আমার যৌবনের কাছ থেকে। পাখির গান আর মাটির সোঁদা গন্ধে ভরা আরগোসের এই সোনালি সন্ধ্যাকে আমি আর কোনোদিন জানব না, জানব না আশার আলোতে দীপ্ত সকালকে—বিদায়, এ সবকিছুকে বিদায়। *[ইলেকট্রার দিকে এগিয়ে]* এসো ইলেকট্রা, এসো আমাদের শহরকে দেখি। ওই-যে দূরে বৈশাখের পড়ন্ত রোদে রাঙা, মানুষ আর মাছির গুঞ্জন মুখরিত, খরতাপে নিস্পন্দ, নিদ্রালু আরগোস। এ শহরের দেয়াল, দরজা, ছাদ সবকিছু আমার জন্য রুদ্ধ। কিন্তু তাহলেও এগুলো আমারই গ্রহণ করার অপেক্ষায় অধীর—আজ সকাল থেকেই এ-কথাটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। তুমি, ইলেকট্রা, তুমিও তাই, তোমাকেও আমি গ্রহণ করব। আমি একটা কুড়োল হয়ে এই নিরেট দেয়ালগুলোকে ভাঙব, এই বন্ধ বাড়িগুলোর পেট ছিঁড়ে ফেলব আর সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবে পচা খাবার আর লোবানের গন্ধ। আমি একটা কুড়োল হয়ে এ শহরের হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঢুকব, যেমন করে কুড়োল ঢুকে ভূপাতিত বৃক্ষের অন্তরে।

ইলেকট্রা ॥ উহ্, কী বিপুল পরিবর্তনই না হয়েছে তোমার। তোমার চোখদুটোতে আগের সে দীপ্তি নেই—কেমন যেন ভাবলেশহীন, ভয়াল। হায় ফিলেবুস তুমি না কত নরম, কত কোমল ছিলে! কিন্তু তুমি এখন কথা বলছ আমার স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত অরেস্টিসের মতো।

অরেস্টিস ॥ শোনো! ধরো ওই প্রেতাত্মা-পরিবৃত অন্ধকার কক্ষে ভীত কম্পমান ওই লোকগুলোর অপরাধ

যদি নিজ কাঁধে তুলে নেই, আমি যদি ওদের সকল অনুশোচনা নিজের কাঁধে তুলে নেই—ওই রমণী, যে তার স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে; ওই ব্যবসায়ী, যে তার মাকে মরতে দিয়েছে নির্মম হেলায়; ওই সুদখোর মহাজন, যে তার ঘাতকের রক্ত চুষে খেয়েছে—ধরো, আমি যদি তাদের সকলের অনুশোচনাকে আমার কাঁধে তুলে নেই, তাহলে? বলো আরগোসের অগুন্তি মাছির মতো শতসহস্র অনুতপ্ত আত্মার দহনকে ধারণ করেও কি আমি তোমাদের মাঝে একজন হবার অধিকার অর্জন করতে পারব না? তখনও কি এই লাল দেয়ালের মাঝে আমাকে তোমাদের অন্তরঙ্গ মনে হবে না—যেমন অন্তরঙ্গ চামড়া খসানো গরুর ঝুলন্ত মৃতদেহের পাশে লাল শালুর নিমা গায়ে নির্মম কসাই।

ইলেকট্রা ॥ তাহলে তুমি আমাদের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও?

অরেস্টিস ॥ প্রায়শ্চিত্ত! না আমি তা বলিনি। আমি বলেছি আমি তোমাদের অনুশোচনাকে নিজের অন্তরে গ্রহণ করব। ওই নির্বোধ কলকণ্ঠ কুক্কুটের দলকে কী করব জানি না। হয়তো ওদের ঘাড় মটকে দেব।

ইলেকট্রা ॥ তাহলে কেমন করে তুমি আমাদের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে নেবে?

অরেস্টিস ॥ কেন, তোমরা তো সবাই তা লাঘব করতে চাও। কেবল ঐ রাজা আর রানী জোর করে তোমাদের হৃদয়ে ঐ বোঝাটা চাপিয়ে রেখেছে।

ইলেকট্রা ॥ রাজা আর রানী...উহ্ ফিলেবুস!

অরেস্টিস ॥ দেবতারা সাক্ষী, আমি ওদের রক্তপাত করতে চাইনি।

ইলেকট্রা ॥ কিন্তু তুমি যে বড় কচি, বড় দুর্বল...

অরেস্টিস ॥ তুমি কি এখন পিছু হটতে চাইছ? এ প্রাসাদের কোথাও আমায় লুকিয়ে রাখো। রাতের বেলায় রাজা-রানীর শোবার ঘরে নিয়ে চলো আমায়—তারপর বুঝবে আমি দুর্বল কিনা!

ইলেকট্রা ॥ অরেস্টিস!

অরেস্টিস ॥ ইলেকট্রা, এই প্রথমবারের মতো তুমি আমায় ডাকলে!

ইলেকট্রা ॥ হ্যাঁ, তুমিই সেই অরেস্টিস; এ নিশ্চয়ই তুমি। প্রথমে চিনতে পারিনি, কারণ আমি যার প্রতীক্ষায় ছিলাম তার সঙ্গে তোমার মিল সামান্যই। কিন্তু আমার মুখে এই তিক্ত স্বাদ, দেহে এই উত্তাপ—এ যে আমার চেনা অনুভূতি, স্বপ্নে হাজারবার অনুভব করেছি। তুমি অবশেষে এসেছ, অরেস্টিস নিয়েছ তোমার অনিবার্য সিদ্ধান্ত। আর আমি সেই অমোঘ সিদ্ধান্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিনের সেই স্বপ্নের মতোই ভীত সন্ত্রস্ত! এই মুহূর্তটিকে কামনা করেছি, লালন করেছি। এখন সব মুহূর্তগুলো একের পর এক অলৌকিকভাবে মিলে যাবে একটা যন্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলোর মতো আর আমরা ততক্ষণ থামব না যতক্ষণ না ওদের দুজনের রক্তাক্ত মৃতদেহ মাটিতে গড়াবে। ভাবতে অবাক লাগে ওদের রক্ত ঝরবে তোমার হাতে—ঐ সুন্দর কোমল দুটি চোখের অধিকারী ফিলেবুসের হাতে—দুঃখ হচ্ছে ঐ কোমলতা আর দেখতে পাব না। অরেস্টিস, তুমি আমার অগ্রজ, আমাদের পরিবারের প্রধান, আমাকে তোমার দুবাহুর মধ্যে গ্রহণ করো, রক্ষা করো, কারণ সামনে আমাদের অনেক বিপদ, অনেক দুঃখ।

*[অরেস্টিস ইলেকট্রাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে। জীয়ুস পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায়।]*

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## দ্বিতীয় পর্ব

রাজপ্রাসাদের দরবার কক্ষ। জীয়ুসের রক্তাপ্লুত একটি মূর্তি। সন্ধ্যাবেলা।

### প্রথম দৃশ্য

প্রথমে ইলেকট্রার প্রবেশ। সে ইশারায় অরেস্টিসকে প্রবেশ করতে বলে।

অরেস্টিস ॥ এদিকে কে যেন আসছে! *[তরবারিতে হাত রাখে]*

ইলেকট্রা ॥ ও কিছু নয়, সান্ত্রীদের গানের শব্দ। আমার পেছন পেছন এসো। এসো ওখানটায় লুকাই। *[সিংহাসনের পিছনে লুকায়]*

### দ্বিতীয় দৃশ্য

একই দৃশ্য। লুক্কায়িত ওরা। দুজন সান্ত্রী।

প্রথম সান্ত্রী ॥ বুঝতে পারছি না আজ মাছিদের হয়েছেটা কী? ওদের উৎপাতে বেহেড পাগল হয়ে যাব।

দ্বিতীয় সান্ত্রী ॥ মৃতদের গন্ধ লেগেছে নাকে, তাই ওদের এই উল্লাস। ভয়ে আমি হাই তুলতে পারছি না পাছে গলা বেয়ে নেমে না পেটের ভিতর ধেই ধেই নাচতে শুরু করে। *[ইলেকট্রা উঁকি দিয়ে—মাথা নামিয়ে নেয়]* আরে কিসের যেন শব্দ হল ওখানটায়!

প্রথম সান্ত্রী ॥ ও কিছু নয়। আগামেমনন তার সিংহাসনে বসল।

দ্বিতীয় সান্ত্রী ॥ তাই বল, ওর মোটা পাছাটা সিংহাসনে রাখতেই অমন ক্যাঁত করে উঠল। কিন্তু সে তো সম্ভব নয়, মৃতদের তো কোনো ওজন নেই।

প্রথম সান্ত্রী ॥ আমার তোমার মতো সাধারণ মৃতের ওজন থাকে না। রাজাবাদশার কথা আলাদা। আগামেমননের ছিল পাক্কা তিনমণী দেহ। ওই বিশাল দেহের খানিকটা মেদ যদি এখনও থেকে যায় তাহলে অবাক হবার কী আছে!

দ্বিতীয় সান্ত্রী ॥ রাজা তাহলে এসে পড়েছেন বলে তোমার মনে হয়!

প্রথম সান্ত্রী ॥ আরে সিংহাসন ছাড়া উনি আর যাবেনটা কোথায় শুনি। আমি যদি মৃত রাজা হতাম আর আমায় ফি-বছর অমন চব্বিশ ঘণ্টার সময় দেয়া হত, তাহলে আমি সময়টা কাটাতাম সিংহাসনের উপর বসে—বসে বসে বিগত জীবনের সুখ-স্মৃতির কথা মনে করতাম। হ্যাঁ, আমি হলে সারাটা দিন তাই করতাম—কারো কোনো ক্ষতি না করে।

দ্বিতীয় সান্ত্রী ॥ বেঁচে আছ বলেই অমন বলছ, বুঝেছ! মৃত হলে অন্যদের মতোই হতে। *[প্রথম সৈনিক তার গালে থাপ্পড় দেয়]* আরে, আরে এ কী করছ তুমি!

প্রথম সান্ত্রী ॥ কেন, তোমার ভালো করছি। ওই যে দ্যাখো একবারে সাতটা মেরেছি।

দ্বিতীয় সান্ত্রী ॥ সাতটা কী? মৃতাত্মা নাকি?

প্রথম সান্ত্রী ॥ আরে না, সাতটা মাছি। এই দ্যাখো আমার হাত কেমন লাল হয়ে গ্যাছে। *[প্যান্টে রক্ত মুছে]* থুহ্, বজ্জাত সব মাছির দল!

দ্বিতীয় সান্ত্রী ॥ ঈশ্বরের কৃপায় ওরা যদি জন্মাবার আগেই মরে সাফ হত। কিন্তু এই মৃতাত্মাদের কাণ্ডটা দ্যাখো না, টুঁশব্দটি করবে না, কারো সাতে পাঁচে নেই। মাছিগুলো মরলে আমরাও বেশ শান্ত হতে পারতাম।

প্রথম সান্ত্রী ॥ চুপ করো। আমার যেন কেমন মনে হচ্ছিল

মাছিরও প্রেতাত্মা আছে ঐ সিঁড়ির নিচে—আর তাহলেই কম্ম কাবার।

দ্বিতীয় সান্ত্রী ॥ কেন?

প্রথম সান্ত্রী ॥ তুমি নিজেই গুনে দ্যাখো না! এই ক্ষুদ্র জীবগুলো লাখে লাখে মরে প্রতিদিন। গেল বোশেখ থেকে আজ পর্যন্ত মৃত সবগুলো মাছির প্রেতাত্মা যদি এ শহরে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে প্রতিটি জীবিত মানুষকে ঘিরে থাকবে তিনশ পঁয়ষট্টিটি মাছি। ইশ! মাছিতে বাতাস গিজগিজ করবে। আমাদের নিঃশ্বাসে থাকবে মাছি, খাবারে মাছি, এমনকি ঘাম দিয়েও মাছি বেরুবে। আমাদের মুখ দিয়ে ঢুকে এক লক্ষ যাবে ফুসফুসে আর পেটে। তাই বোধহয় কেমন যেন একটা বিশেষ গন্ধ পাচ্ছি এখানটায়।

দ্বিতীয় সান্ত্রী ॥ আরে না। হাজার ফিট চওড়া এমন কক্ষের বায়ু দূষিত করতে কয়েকটি মানবের প্রেতাত্মাই যথেষ্ট। শুনেছি আমাদের মৃতদের মুখে নাকি ভীষণ দুর্গন্ধ।

প্রথম সান্ত্রী ॥ আরে শোনো, ওরা নাকি সবাই দুশ্চিন্তায় জর্জরিত...

দ্বিতীয় সান্ত্রী ॥ আমি তোমায় আগেই বলেছি, ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে। মেঝেতে কেমন যেন শব্দ হল!

*[তারা সিংহাসনের পেছনটা দেখার জন্য ডান দিক দিয়ে যায়। অরেস্টিস ও ইলেকট্রা বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে—সিংহাসনের সামনের সোপান বেয়ে ঘুরে আবার পূর্বের স্থানে যায়। সান্ত্রীরা বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে।]*

প্রথম সান্ত্রী ॥ দেখলে তো কেউ নেই ওখানে। বলেছি তো ও বুড়ো আগামেমনন ছাড়া কেউ নয়—গদির উপর

পেরেকের মতো সটান বসে আছে—আর ওখান থেকে আমাদের দেখছে। আমাদের দেখা ছাড়া আর কীই-বা করার আছে ওঁর।

দ্বিতীয় সান্ত্রী ॥ এসো খানিকটা পায়চারি করে জায়গা বদল করি। তাতে ঐ বজ্জাত মাছিগুলোর হাত থেকে বাঁচা যাবে অন্তত!

প্রথম সান্ত্রী ॥ এ সময়টা ছাউনিতে থেকে তাস পিটতে পারলে ভালো ছিল। ওখানে মৃতরা আমাদেরই পুরনো ইয়ার দোস্‌ত, আমাদের মতোই সাধারণ সেপাই। কিন্তু যখন ভাবি মৃত রাজা ওখানে দাঁড়িয়ে আমার কুর্তার হারানো বোতামগুলো গুনে গুনে দেখছেন, তখন আমার যেন গা কেমন কেমন করে—ঠিক ঐ জেনারেল পরিদর্শনে আসলে যেমনটা হয়।

*[ইজিসথাস, ক্লাইটেমনেস্ট্রার প্রবেশ। ভৃত্যদের প্রদীপ হাতে ওদের পেছনে পেছনে আগমন।]*

ইজিসথাস ॥ তোমরা সবাই চলে যাও।

## তৃতীয় দৃশ্য

ইজিসথাস, ক্লাইটেমনেস্ট্রা—আড়ালে অরেস্টিস ও ইলেকট্রা।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ কী হল তোমার?

ইজিসথাস ॥ দেখলে তো ওদের অন্তরে যদি ওই অমনভাবে ভয় ধরিয়ে না দিতে পারতাম তাহলে সব অনুশোচনা ওরা ঝেড়ে ফেলত চক্ষের পলকে।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ বিচলিত বোধ করার কিছু নেই। প্রয়োজনের মুহূর্তে সবসময়ই ওদের সাহসকে হিম করে দিতে পারবে তুমি।

ইজিসথাস ॥ সে আমি জানি। সে খেলায় আমার নৈপুণ্যের

অভাব নেই। *[নীরব থেকে]* ইলেকট্রাকে অমন ভর্ৎসনা করে খুব অনুতপ্ত বোধ করছি।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ কেন, ও আমার মেয়ে বলে? তোমার ইচ্ছে বকেছ। তোমার কোন্ কাজে অমত করেছি বল।

ইজিসথাস ॥ রানী, অনুতপ্ত বোধ করছি তোমার কারণে নয়।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ তাহলে কেন? ইলেকট্রার প্রতি খুব-একটা স্নেহও তো তোমার কখনোই ছিল না।

ইজিসথাস ॥ আমি ভীষণ ক্লান্ত। পনেরো বছর ধরে একটা গোটা শহরের অনুশোচনাকে আমি ধারণ করে আছি। পনেরো বছর ধরে আমি একটা কাকতাড়ুয়ার খোলস পরে আছি; আমার এ কালো পোশাকগুলোর রঙ আমার অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ কিন্তু রাজন, আমিও...

ইজিসথাস ॥ আমি জানি। জানি, তুমি তোমার অনুশোচনার কথা বলবে। আমি তোমার অনুশোচনাকে ঈর্ষা করি, তা অন্তত তোমার জীবনের শূন্যতাকে ভরাট করে দেবার মতো কিছু তো বটে। আমার তো তাও নেই, সারা আরগোসে আমার চেয়ে বিষণ্ন বিপন্ন আর কেউ নেই।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ রাজন, প্রিয়তম!

*[ইজিসথাসের নিকটে যেতেই]*

ইজিসথাস ॥ থাম্, কুলটা নারী, ওর চোখের সামনেও কি তোর এতটুকু লজ্জা নেই?

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ কার চোখ? কে আমাদের দেখছে এখানে?

ইজিসথাস ॥ কেন, রাজার! মৃতরা আজ সকালে বেরিয়ে এসেছে গহ্বর থেকে।

ক্লাইটেমনেস্ট্রা ॥ রাজন, দয়া করে শুনুন...মৃতরা সব মৃত্তিকার নিচে, আমাদের উত্ত্যক্ত করতে আসবে না কোনোদিন।

কেন ভুলে যাচ্ছেন, প্রজাদের বশে রাখার জন্য ও কল্পিত কাহিনীর সৃষ্টি তো আপনিই করেছেন?

ইজিসথাস ॥ তাইতো, ভুলেই গিয়েছিলাম। দেখলে রানী কেমন ক্লান্ত আমি, যাও এখন একটু একা থাকতে দাও আমায়!

*[ক্লাইটেমনেস্ট্রার প্রস্থান]*

## চতুর্থ দৃশ্য

ইজিসথাস। অরেস্টিস ও ইলেক্ট্রা আড়ালে।

ইজিসথাস ॥ হে জীয়ূস, আমিই কি সেই রাজা, আরগোসের জন্য যার প্রয়োজন ছিল তোমার? প্রজাদের মধ্যে আমি আসি, আমি যাই, আমার ভয়াল মুখাবয়ব নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই—যারা আমায় দ্যাখে তারা একটা প্রবল অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। কিন্তু আমি যেন একটা শূন্য আবরণ মাত্র। একটা পশু যেন অজান্তে আমার ভেতরটা খুবলে নিয়েছে। নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আমি যেন আগামেমননের চাইতে বেশি মৃত। আমি আমার বিষণ্নতার কথা বলেছিলাম। মিথ্যা বলেছিলাম। বিষণ্ন নয়, আনন্দময় নয়, আমার মনটা যেন একটা শূন্যতা—স্বচ্ছ শূন্য আকাশের তলে একরাশ বালির শূন্যতা—কেমন যেন অস্বস্তিকর। হায়, একফোঁটা চোখের পানি ফেলার জন্য আমি আমার সমস্ত রাজ্য দিয়ে দিতে পারি!

*[জীয়ূসের প্রবেশ]*

## পঞ্চম দৃশ্য

ইজিসথাস। লুক্কায়িত অবস্থায় অরেস্টিস ও ইলেকট্রা।

জীয়ূস ॥ দোষারোপ করছ, বেশ। তুমি আর অন্যান্য রাজাদের চাইতে ভিন্ন হবে কেন?

ইজিসথাস ॥ কে তুমি? কী করছ এখানে?

জীয়ূস ॥ আমাকে চিনতে পারছ না? আশ্চর্য!

ইজিসথাস ॥ যাও, বের হও এখান থেকে, রক্ষীদের হাতে গলাধাক্কা খাবার আগে কেটে পড়ো।

জীয়ূস ॥ তুমি আমায় চিনতে পারছ না! স্বপ্নে তুমি আমায় বহুবার দেখেছ। অবশ্য এ-কথা সত্যি যে আমার চেহারা সেখানে ছিল ভয়ঙ্কর। *[বিদ্যুতের ঝলকানি ও পরে বজ্রপাতের শব্দ। জীয়ূসের চেহারায় ভয়ঙ্কর ছাপ ফুটে ওঠে]* অনেকটা এই রকম, কি বলো!

ইজিসথাস ॥ জীয়ূস!

জীয়ূস ॥ হ্যাঁ, আমি স্বয়ং। *[মুখে আবার প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠে। ধীরে ধীরে নিজের মূর্তির কাছে যায়]* এই তাহলে আমি, এই রূপেই আরগোস অধিবাসীরা তাদের প্রার্থনায় আমার ধ্যান করে। দেবতা তাঁর আপন মূর্তিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখছেন, এমনটা কালেভদ্রে ঘটে, কি বলো। *[ক্ষণিকের নীরবতা]* কী কুৎসিত দেখতে আমি। আমাকে তো ওদের ভালোবাসার কথা নয়।

ইজিসথাস ॥ ওরা আপনাকে ভয় করে।

জীয়ূস ॥ চমৎকার। ওদের প্রেমে আমার কাজ নেই। কিন্তু ইজিসথাস, তুমি তো আমায় ভালোবাস?

ইজিসথাস ॥ আর কী চাও আমার কাছে। আমি কি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট মাশুল দেইনি?

জীয়ূস ॥ যথেষ্ট কখনোই যথেষ্ট নয়!

ইজিসথাস ॥ কিন্তু এ-কাজের চাপে আমি যে মরে যাচ্ছি।

জীয়ূস ॥ বালাই ষাট! অমন বাড়িয়ে বোলো না। স্বাস্থ্য তো তোমার ভালোই আছে। চর্বিও হয়েছে বেশ। আরে না! আমি বিদ্রূপ করছি না। ও তো রাজকীয় চর্বি, হলুদ মোমের মতো, ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত। তুমি নির্ঘাত আরো বিশ বছর বাঁচবে।

ইজিসথাস ॥ আরো বিশ বছর!

জীয়ূস ॥ কেন, তুমি কি মরতে চাও নাকি?

ইজিসথাস ॥ হ্যাঁ।

জীয়ূস ॥ বেশ। কিন্তু কেউ যদি খোলা তরবারি হাতে এগিয়ে আসে তাহলে তুমি কি বুক পেতে দেবে?

ইজিসথাস ॥ আমি জানি না।

জীয়ূস ॥ শোনো তবে! তুমি যদি নিজেকে একটা নির্বাক পশুর মতো বলি হতে দাও তবে তোমার শাস্তি হবে বেমিসাল। তুমি নরকের রাজা হয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে। তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিতেই আমি এসেছিলাম।

ইজিসথাস ॥ কেউ কি আমাকে হত্যা করতে চায়?

জীয়ূস ॥ তাই তো মনে হচ্ছে।

ইজিসথাস ॥ ইলেক্ট্রা কি?

জীয়ূস ॥ শুধু ইলেক্ট্রা নয়।

ইজিসথাস ॥ কে?

জীয়ূস ॥ অরেস্টিস।

ইজিসথাস ॥ হুঁম! *[নীরবতা]* এ তো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। তা আমি কী করতে পারি?

জীয়ূস ॥ [অনুকরণ করে] কী করতে পারি। *[উদ্ধত কণ্ঠে]* তোমার রক্ষীদের ফিলেবুস নামে একজন আগন্তুক যুবককে গ্রেফতারের আদেশ দাও। ইলেক্ট্রা এবং

ঐ যুবককে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করো—আর সে অন্ধকূপে যদি ওদের পচতে দাও তাহলে আমি খুশিই হব। কী হল! দাঁড়িয়ে কেন?—প্রহরীদের ডাকো!

ইজিসথাস ॥ না।

জীয়ূস ॥ অনুগ্রহ করে তোমার ঐ অস্বীকৃতির কারণটা জানাবে কি?

ইজিসথাস ॥ আমি ক্লান্ত।

জীয়ূস ॥ কী হল, মাটির দিকে তাকাচ্ছ কেন? তোমার ঐ রক্তাপ্লুত চোখদুটি তুলে আমার চোখে তাকাও। এই তো বেশ। তুমি দেখছি ঘোড়ার মতো, মহৎও বটে। তোমার একগুঁয়েমিতে আমি মোটেও বিরক্ত হচ্ছিনে। এ বরং ব্যঞ্জনে মসলার মতো, কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার আত্মসমর্পণের আনন্দকে করবে রসঘন। কারণ আমি জানি অবশেষে তুমি আমার আদেশ পালন করবে।

ইজিসথাস ॥ আমি তো আপনাকে বলেছি—আপনার ছলচাতুরীতে অংশ নিতে চাইনে আমি। ইতিমধ্যেই বহুবার তা করেছি—আর নয়।

জীয়ূস ॥ সাধু! সাধু! প্রতিরোধ! প্রতিবাদ! তোমার চোখে আগুন, প্রত্যয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ, আর জীয়ূসের মুখের উপর অমন দাঁতভাঙা জবাব—এ সবই আমার পছন্দ। তোমার মতো অগ্নিপুরুষদের ভীষণ ভালো লাগে আমার। কিন্তু হে আমার খুদে বিপ্লবী, অশ্বশাবকের মতো অস্থির চঞ্চল যদিও তুমি, আমার সাবধানবাণী উচ্চারণের সাথে সাথে তোমার হৃদয় কি তাৎক্ষণিক সম্মতি দেয়নি? তুমি অবশ্যই আমার আদেশ পালন করবে, আলবত করবে। তুমি কি ভাবো আমি অনর্থক অলিম্পাস

পর্বত ছেড়ে এসেছি? অমঙ্গল এড়ানোই আমার একান্ত ইচ্ছা, আর তাই তোমাকে হুঁশিয়ার করতে এসেছি।

ইজিসথাস ॥ আমাকে হুঁশিয়ার। আশ্চর্য বটে!

জীয়ূস ॥ আশ্চর্য কেন, বরং বলো স্বাভাবিক। তোমার জীবনের উপর ঘনিয়ে আসা ও বিপদ আমি এড়াতে চাই।

ইজিসথাস ॥ কে তা করতে বলেছে আপনাকে? আগামেমননের বেলায় তা করেননি কেন? সেও তো বাঁচতে চেয়েছিল।

জীয়ূস ॥ উহ্ অকৃতজ্ঞ বটে! ওহে বিষণ্ন পুঙ্গব, তোমাকে আগামেমননের চাইতে বেশি ভালোবাসি, এ-কথার চাক্ষুষ প্রমাণ যখন দিতে এসেছি, তখন কিনা তোমার এই নালিশ!

ইজিসথাস ॥ আগামেমননের চাইতে প্রিয়! আমি! কেন, আপনার চোখের মণি তো ঐ অরেস্টিস। আপনি আমাকে সর্বনাশ ডেকে আনতে দিয়েছেন—নগ্ন তরবারি হাতে ছুটে যেতে দিয়েছেন রাজার স্নানঘরে—পর্বতশিখরে বসে দৃশ্যটি নিশ্চয়ই সিক্ত রসনায় উপভোগ করেছেন, কারণ পাপাত্মার সন্তপের স্বাদ আপনার কাছে বড় মধুর! আজ অরেস্টিসকে আপনি দিচ্ছেন নিরাপত্তা, সযত্নে রক্ষা করছেন তাকে—আর যে-আমি আপনার প্ররোচনায় তার পিতাকে হত্যা করেছি, আমাকে আপনি সে নবীন যুবকের তরবারিকে সংযত করতে বেছে নিয়েছেন। আমি তো একজন ঘৃণ্য আততায়ী মাত্র। কিন্তু অরেস্টিসের ভাগ্যের প্রতি আপনি-যে উদারহস্ত তাতে আমি নিঃসন্দেহ।

জীয়ূস ॥ এক আশ্চর্য ঈর্ষা! আশ্বস্ত হও। আমি তোমার চেয়ে বেশি ভালোবাসি না ওকে। আমি কাউকেই ভালোবাসি না।

ইজিসথাস ॥ তবে আপনিই বুঝে দেখুন আপনি আমার জন্য কী করেছেন, হে জালিম দেবতা। আজ অরেস্টিসের পরিকল্পিত খুনকে বাধা দিতে আপনার উৎকণ্ঠার শেষ নেই। অথচ পনেরো বছর আগে আমি যে খুন করেছিলাম, তাতে তো বাধা দেননি?

জীয়ূস ॥ সব খুনের প্রতি আমার বিরাগ সমান নয়। তা শোনো হে, আমরা দুজনেই রাজা, অতএব খোলাখুলিই বলি। মানুষকে মরণশীল হিশেবে সৃষ্টি করে প্রথম অপরাধটা করেছিলাম আমিই। এরপর তোমাদের মতো আততায়ীরা কীই-বা করতে পারো? তোমাদের অসহায় শিকারদের মৃত্যুর স্বাদ না দিয়ে কীই-বা করতে পারো? মৃত্যুর বীজ তো ওদের মধ্যেই রয়েছে—তোমরা বড়জোর তা খানিকটা ত্বরান্বিত করে দিচ্ছ—একবছর কি দুবছর এই যা। আগমেমননকে তুমি খুন না করলে ওর কী হত জানো? তিন মাস পরে এক সুন্দরী ক্রীতদাসী রমণীর বাহুলগ্ন হয়ে মারা যেত সন্ন্যাস-রোগে। কিন্তু তুমি এগিয়ে আসাতে আমার কাজ হল।

ইজিসথাস ॥ আপনি জানতেন? পনেরো বছর আমি অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছি আর আপনি বলেছেন আপনি জানতেন। কী সর্বনাশ!

জীয়ূস ॥ তাতে কী? তুমি অনুশোচনা করছ তাই আমার বেজায় কাজ হচ্ছে। আমি এমন সব অপরাধ পছন্দ করি যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তোমার অপরাধ বিশেষ পছন্দ, কারণ এ ছিল বিবেকবর্জিত

আদিম, ভয়াল—একটা প্রবল ধ্বংসের মতো। এক লহমার জন্যও তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ করোনি। ক্রোধ এবং ভীতের মত্ততায় তুমি আঘাত করেছিলে। উন্মত্ত এই ক্রোধ প্রশমিত হলে তুমি এর দিকে তাকিয়েছিলে পরম ঘৃণায়, স্বীকার করতে চাওনি এ অপরাধকে। কিন্তু কী বিপুল লাভই না আমার হয়েছে এ থেকে। একটি মৃত মানুষের জন্য বিশ হাজার নরনারী সন্তাপের আবর্তে খাবি খাচ্ছে। আলবত, একটা বিরাট লাভ হয়েছিল বৈকি সেদিন।

ইজিসথাস ॥ তোমার কথাগুলোর অর্থ আমি বুঝতে পারছি। অরেস্টিসের তাহলে কোনো অনুশোচনা থাকবে না।

জীয়ূস ॥ বিন্দুমাত্র না। এই মুহূর্তে সে ফন্দি আঁটছে, সানন্দে ঠাণ্ডা মাথায়। যে-অপরাধে গ্লানি নেই, কুণ্ঠা নেই, যে-অপরাধ বিবেকের বুকে হালকা-প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়ায়, তেমন অপরাধে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। না, আমি তা হতে দেব না। এই নব্যযুগের অপরাধকে আমি ঘৃণা করি। কারণ সে-অপরাধ একেবারেই বন্ধ্যা, কৃতঘ্ন, হাওয়ার মতো হালকা। হ্যাঁ, ঐ সুন্দর নব্যযুবক তোমাকে মুরগির মতো অনায়াসে জবাই করবে—তারপর রক্তাক্ত হাতে নির্ভার হৃদয়ে চলে যাবে। তোমার জায়গায় হলে আমি অপমানিত বোধ করতাম। অতএব রাজন, তোমার সান্ত্রীদের ডাকো।

ইজিসথাস ॥ 'না' তো আমি একবারই বলেছি। অপরাধের যে-ষড়যন্ত্র চলছে তার প্রতি আপনার বিরাগ এতবেশি যে আমি তাকে স্বাগত না-জানিয়ে পারছি না।

জীয়ূস ॥ *[কথার সুর পাল্টিয়ে]* ইজিসথাস, তুমি রাজা। আমি একজন রাজার বিবেকের সঙ্গে কথা বলছি। কারণ এ রাজদণ্ড তোমার বড় প্রিয়।

ইজিসথাস ॥ বলুন।

জীয়ূস ॥ তুমি আমাকে ঘৃণা করো। কিন্তু আমরা দুজনা কত কাছাকাছি। আমি তোমাকে আমার মতো করে গড়েছি। তুমি রাজা—মর্ত্যে একজন দেবতার মতোই মহৎ কিন্তু ভয়াল।

ইজিসথাস ॥ ভয়াল, আপনি!

জীয়ূস ॥ এদিকে তাকাও। *[নীরবতা]* বলেছি তো, তোমাকে আমি গড়েছি আমার প্রতিমা করে। আমরা দুজনেই শান্তি বজায় রাখছি—তুমি এখানে আরগোসে, আমি স্বর্গে। আমাদের দুজনের অন্তরই একই গোপন কথার ভারে জর্জরিত।

ইজিসথাস ॥ আমার অন্তরে কোনো গোপন কথা নেই।

জীয়ূস ॥ আছে। আমার মতোই তোমারও আছে—রাজা এবং দেবতার বিষাদঘন গোপন কথা—আর তা হচ্ছে কি জানো? মানুষ স্বাধীন। ইজিসথাস, মানুষ স্বাধীন। তুমি এ সত্যটি জানো—তোমার প্রজারা জানে না।

ইজিসথাস ॥ হায় ঈশ্বর! ওরা জানতে পেলে আমার প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেবে। আমি আজ পনেরো বছর এই সত্যটিকে ওদের কাছ থেকে গোপন করে রাখার জন্য অভিনয় করে যাচ্ছি।

জীয়ূস ॥ তবেই বুঝে দ্যাখো। আমার তোমার মধ্যে সাদৃশ্যটা কতখানি।

ইজিসথাস ॥ সাদৃশ্য! দেবতা নিজেকে আমার সঙ্গে তুলনা করেন এ কেমন উদ্ভট পরিহাস। তখ্‌তে আসীন হবার পর থেকে আমার সব কথা, সব কাজই

নিবেদিত হয়েছে আমার নিজের একার ভাবমূর্তি গড়ার কাজে। আমি চাই আমার প্রজারা সে-মূর্তিটিকে সামনে রাখুক, ভাবুক যে গোপনতম মুহূর্তেও আমি তাদের অন্তরঙ্গ চিন্তার বিচার করছি। কিন্তু আমি আমার নিজের জালেই জড়িয়ে গেছি। আমি নিজেকে দেখতে শুরু করেছি ওদের মতো করে। আমি ওদের অন্তরের গভীরে ডুব দিয়ে নিজেকে—নিজের সেই মূর্তিকে দেখে শিউরে উঠি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিতে পারি না। হে সর্বশক্তিমান জীয়ূস, বলুন, আমি কে? আমি অন্যের মনে সেই ভয়াল ভীতির চাইতে বেশি কিছু?

জীয়ূস ॥ আর আমি। আমি কে বলো দেখি? *[মূর্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে]* আমারও একটা ভাবমূর্তি আছে। সে মূর্তি কি আমার মনেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে না। লক্ষ বছর ধরে মানুষের সামনে আমি নেচে যাচ্ছি প্রথাসম্মত ধীর লয়ে। ওদের চোখ আমাতে এমনই গভীরভাবে নিবদ্ধ যে ওরা নিজেদের অন্তরে দৃষ্টিপাত করতে ভুলে যায়। আমি যদি মুহূর্তের জন্যও নিজেকে বিস্মৃত হতাম—ওদের চোখ ফেরাতে দিতাম ...

ইজিসথাস ॥ তাহলে...

জীয়ূস ॥ ব্যস! বাকিটা আমার ব্যাপার। ইজিসথাস, কিসের আক্ষেপ তোমার—তুমি তো একদিন মরবে কিন্তু আমাকে এই বিরামহীন নাচ নেচে যেতে হবে চিরকাল। মর্ত্যে যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন এ অভিশাপের ইতি নেই।

ইজিসথাস ॥ হায় আমাদের এ অভিশাপ কে দিল।

জীয়ূস ॥ কে আবার, আমি। তোমার ইচ্ছাগুলো আমার মতোই—তুমিও শৃঙ্খলা পছন্দ করো।

ইজিসথাস ॥ শৃঙ্খলা! সে সত্যি। এই শৃঙ্খলার জন্যই ক্লাইটেমনেস্ট্রার মন জয় করেছি, আমার রাজাকে খুন করেছি, আমি চেয়েছি ঐ শৃঙ্খলা বজায় থাকুক—থাকুক আমার মাধ্যমে। আমি প্রেমহীন আশাহীন এমনকি কামনাহীন জীবনযাপন করেছি। কিন্তু আমি আমার রাজ্যে শৃঙ্খলা বজায় রেখেছি। আমার সেটাই ছিল নেশা—কী দুর্বার, কী ঐশ্বরিক নেশা।

জীয়ূস ॥ আমাদের আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। আমি স্বর্গের দেবতা আর তুমি মর্ত্যে জন্মেছ রাজা হয়ে।

ইজিসথাস ॥ হায়।

জীয়ূস ॥ ইজিসথাস, হে প্রিয়বৎস! হে আমার মরণশীল ভ্রাত—এই শৃঙ্খলার জন্যই আমি তোমায় অনুরোধ—না, না, তোমায় আমি আদেশ করছি—অরেস্টিস ও ইলেকট্রাকে আঘাত করো।

ইজিসথাস ॥ ওরা কি এতই মারাত্মক?

জীয়ূস ॥ অরেস্টিস জানে ও স্বাধীন।

ইজিসথাস ॥ *[সাগ্রহে]* সে জানে সে স্বাধীন? তাহলে তাকে আঘাত করা, তাকে শৃঙ্খলিত করাই যথেষ্ট নয়। নগরে একটি মুক্ত লোক প্লেগের উৎসের মতো। সে আমার সারা রাজ্য কলুষিত করবে—আমার সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তুমি দাঁড়িয়ে কেন—কেন তোমার বজ্রের আঘাত হানছ না তার প্রতি?

জীয়ূস ॥ [ধীরে] বজ্রের আঘাত হানব *[থেমে, তারপর রুদ্ধ স্বরে]* ইজিসথাস, দেবতাদের আর-একটা গোপন কথা আছে।

ইজিসথাস ॥ সেটা কী?

জীয়ূস ॥ একবার মানবমনে স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বললে দেবতারা সে-মানুষের কাছে নির্বীর্য নপুংসক। তখন ব্যাপারটা মানুষে মানুষে—তখন কেবল অন্য মানুষই পারে তাকে নিজের চলার ছন্দে চলতে দিতে কিংবা তার কণ্ঠরোধ করতে।

ইজিসথাস ॥ *[স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে]* কণ্ঠরোধ করতে...তবে তাই হোক। আমি অবশ্যই আপনার আদেশ পালন করব, কিন্তু কোনো কথা বলবেন না—চলে যান এখান থেকে, কারণ আপনাকে আমি আর সইতে পারছি না। [জীয়ূসের প্রস্থান]

## ষষ্ঠ দৃশ্য

ইজিসথাসের কয়েক মুহূর্ত একা অবস্থান। ইলেকট্রা এবং অরেস্টিসের প্রবেশ।

ইলেকট্রা ॥ *[লাফ দিয়ে দুয়ার বন্ধ করতে যেতে যেতে]* আঘাত করো ওকে। চিৎকার করার সময় দিও না। আমি দুয়ার বন্ধ করছি।

ইজিসথাস ॥ তাহলে তুমিই অরেস্টিস?

অরেস্টিস ॥ আত্মরক্ষা করো।

ইজিসথাস ॥ না, আত্মরক্ষা আমি করব না। চিৎকার করে সাহায্য চাইতে অনেক দেরি হয়ে গেছে—আর এ দেরির জন্য আমি আনন্দিত। আমি তাই বাহুবলে আত্মরক্ষা করব না। আমি চাই যে তুমি আমায় হত্যা করো।

অরেস্টিস ॥ বেশ তাই হোক তবে। কাজটা হলেই হল—নিমিত্তে কী আসে যায়! আমাকে খুনি হতে হবে তাহলে।

*[তরবারি দিয়ে ইজিসথাসকে আঘাত করে]*

ইজিসথাস ॥ *[টলতে টলতে]* আ! অরেস্টিস তোমার আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। *[অরেস্টিসকে আঁকড়ে ধরে]* তোমায় দেখতে দাও! আচ্ছা সত্যি কি তোমার কোনো অনুশোচনা নেই?

অরেস্টিস ॥ অনুশোচনা! কিসের! যা ন্যায়সঙ্গত আমি তো কেবল তাই করেছি।

ইজিসথাস ॥ ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন তাই ন্যায়। তুমি এখানে লুকিয়ে জীয়ূসের কথা শুনেছ।

অরেস্টিস ॥ জীয়ূসের কে পরোয়া করে? ন্যায়নীতি তো মানুষের ব্যাপার—ওটা শেখার জন্য আমার কোনো ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। তোর মতো বদমায়েশকে খতম করাটাই ইনসাফ—আরগোসের জনগণের উপর তোর প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে তাদের আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়াই ন্যায়সঙ্গত।
*[ইজিসথাসকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়]*

ইজিসথাস ॥ উহ্ কী যন্ত্রণা!

ইলেকট্রা ॥ দ্যাখো, দ্যাখো! ও কেমন টলছে, ওর মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। উফ! মানুষের মরবার দৃশ্যটা কী জঘন্য!

অরেস্টিস ॥ চুপ করো! আমাদের উল্লাস ছাড়া অন্য কোনো স্মৃতি ও কবরে নিয়ে যাক সেটা আমি চাই না।

ইজিসথাস ॥ আমি তোদের দুজনকেই অভিশাপ দিচ্ছি।

অরেস্টিস ॥ মরবার কাজটাও তাড়াতাড়ি সারবে না, দেখছি!
*[ইজিসথাসকে আঘাত করে। ইজিসথাসের পতন]*

ইজিসথাস ॥ মাছির হাত থেকে সাবধান, অরেস্টিস! সাবধান, এখানেই সবকিছুর শেষ নয়।
*[ইজিসথাসের মৃত্যু]*

অরেস্টিস ॥ *[মৃতদেহে পদাঘাত করে]* তোর তো সব শেষ হল! আমায় রানীর কক্ষে নিয়ে চল!

ইলেকট্রা ॥ অরেস্টিস।

অরস্টিস ॥ চল!

ইলেকট্রা ॥ সে তো আর আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

অরেস্টিস ॥ কী ব্যাপার! এই কি সেই তুমি যে কিছুক্ষণ আগে কথা বলছিলে। আমি তো তোমায় চিনতে পারছি না।

ইলেকট্রা ॥ অরেস্টিস! আমিও তোমায় আর চিনতে পারছি না।

অরেস্টিস ॥ বেশ, তাহলে আমি একাই যাব!

*[প্রস্থান]*

## সপ্তম দৃশ্য

ইলেকট্রা নির্জন

ইলেকট্রা ॥ মা কি চিৎকার করবে! *[শোনবার চেষ্টা করে]* ও বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! ও যখন চতুর্থ দুয়ারটি খুলবে—ওহ্ আমি তো এই চেয়েছিলাম—এবং আমি, আমি এখনও তাই চাই। *[ইজিসথাসের দিকে চেয়ে]* ওই যে ও ওখানে মৃত। এও তো আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু ওর পরিণতি আমি ভাবতে পারিনি। হাজারবার স্বপ্নে আমি ওকে ওখানটায় পড়ে থাকতে দেখেছি তরবারিবিদ্ধ অবস্থায়। ওর চোখ ছিল বন্ধ, মনে হচ্ছিল যেন ঘুমিয়ে। উহ্ কী ঘৃণাই না আমি করেছি ওকে—কী আনন্দই না পেয়েছি ওকে ঘৃণা করে। কিন্তু আজ ওকে ঘুমন্ত মনে হচ্ছে না, ওর চোখদুটো খোলা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ও মৃত—ওর সঙ্গে আমার

ঘৃণারও মৃত্যু হয়েছে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে—প্রতীক্ষায় আছি অধীর আগ্রহে। আর অন্যজন এখনও বেঁচে আছে তার শোবার ঘরে—কিছুক্ষণের মধ্যে ও চিৎকার করবে। চিৎকার করবে যন্ত্রণাকাতর একটি পশুর মতো। না, ঐ চোখের দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না। *[নত হয়ে ইজিসথাসের মুখের উপর একটা চাদর টেনে দেয়]* আমি তাহলে কী চেয়েছিলাম। কী চেয়েছিলাম! *[নীরবতা। তারপর ক্লাইটেমনেস্ট্রার আর্তচিৎকার]* অরেস্টিস ওকে আঘাত করেছে। *[দাঁড়িয়ে]* সব শেষ। আমার শত্রুরা সব খতম হয়েছে। বছরের পর বছর আমি এ মুহূর্তটিকে কামনা করেছি—কিন্তু লগ্ন যখন এল তখন আমার হৃদয় এমন অব্যক্ত ব্যথায় কাতর কেন! পনেরো বছর ধরে আমি কি নিজের সঙ্গে প্রতারণা করে এসেছি? না, না, এ সত্যি নয়, এটা সত্যি হতে পারে না। আমি ভীরু নই। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে এই আমি কামনা করেছিলাম। আমি বদলে যাইনি। আমি বেশ্‌ক খুশি, ওই শুয়োরটাকে আমার পায়ের কাছে পড়ে থাকতে দেখে আমি উল্লসিত। *[রাজার মুখ থেকে একটানে কাপড় সরিয়ে]* তোমার ঐ মৃত মাছের মতো চোখদুটিতে আমার আর কিছু আসে যায় না। আমি এমনটিই চেয়েছিলাম—তাই আমি আনন্দিত, খুশি, খুশি! *[ক্লাইটেমনেস্ট্রার আর্তচিৎকার স্তিমিত হয়ে আসে]* আহ কী চিৎকার! কী মিষ্টি চিৎকার। অরেস্টিস, ওর চিৎকারে বিদীর্ণ হোক চারিদিক। আমি ওর যন্ত্রণা দেখতে চাই!

*[ক্লাইটেমনেস্ট্রার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়]* আহ্ কী আনন্দ! কী সুখ! আনন্দে আমি কাঁদছি। আমার শত্রুরা খতম হয়েছে। পিতার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।

*[রক্তরঞ্জিত তরবারি হাতে অরেস্টিসের প্রত্যাবর্তন। ইলেকট্রা দৌড়ে ওর দিকে যায়]*

## অষ্টম দৃশ্য

ইলেকট্রা-অরেস্টিস

ইলেকট্রা ॥ অরেস্টিস! *[ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে]*

অরেস্টিস ॥ ভয় পেয়েছ। কেন? ভয় কিসের!

ইলেকট্রা ॥ ভয় পাইনি—আমি পাগল হয়ে গেছি; আনন্দে আমি পাগল হয়ে গেছি, মা কী বলল! খুব কি কাতর অনুনয় করেছে?

অরেস্টিস ॥ ইলেকট্রা! যা করেছি তার জন্য কোনো অনুশোচনা করব না। সুতরাং অন্যকথা বলো! কিছু কিছু স্মৃতি আছে যার ভাগ কাউকে দেওয়া যায় না। শুধু এইটুকু শুনে রাখো, মা নেই।

ইলেকট্রা ॥ মরার সময় মা কি আমাদের অভিশাপ দিয়েছে? আমায় শুধু এটুকু বলো!

অরেস্টিস ॥ হ্যাঁ, মরার সময় মা আমাদের অভিশাপ দিয়েছে।

ইলেকট্রা ॥ অরেস্টিস আমায় আরো একটু শক্ত করে ধরো। বুকে জড়িয়ে রাখো। রাতের আঁধার কত গভীর। এমন অন্ধকার কখনো দেখিনি। ঐ মশালের আলো অন্ধকারকে দূর করতে পারছে না। অরেস্টিস, আমি তোমায় ভালোবাসি।

অরেস্টিস ॥ রাত কেটে গেছে ইলেকট্রা। একটা নতুন দিনের জন্ম হচ্ছে। আমরা মুক্ত, ইলেকট্রা। আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাকে একটা নতুন জীবনে নিয়ে এসেছি। আর আমিও যেন জন্মলাভ করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমিও তোমায় ভালোবাসি, তুমি একান্তই আমার। গতকালও আমার হাতদুটি ছিল রিক্ত, কিন্তু আজ তুমি রয়েছ। রক্ত আমাদের একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে—কেননা আমাদের শিরায় বইছে একই রক্ত আর আমরা দুজনেই সে-রক্তে হাত রাঙিয়েছি।

ইলেকট্রা ॥ হাতের তরবারি ফ্যাল। এসো দেখি, তোমার হাত দাও। *[হাতে চুমু খেয়ে]* তোমার আঙুলগুলো ছোট কিন্তু প্রশস্ত। কেমন মিষ্টি হাত। আমার হাতের চেয়েও ফরসা। পিতার হন্তারকদের সংহার করতে গিয়ে কেমন নির্মম হয়েছিল এ দুটি হাত। দাঁড়াও! *[অরেস্টিসের মুখের কাছে প্রদীপ ধরে]* তোমার মুখের কাছে আলো ধরে রাখতে হবে—অন্ধকার তোমার মুখকে গ্রাস করতে চাইছে। আমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না তোমায়। তোমাকে আমার দেখতেই হবে—তোমার দিকে না-তাকালে আমার ভয় করে। আমি তাই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি না তোমার মুখ থেকে। আমি তোমায় ভালোবাসি—আর এ-কথাটা নিজেকে হাজারবার বলতে হচ্ছে। তোমার দৃষ্টি যেন কেমন অদ্ভুত, অচেনা!

অরেস্টিস ॥ আমি মুক্ত, স্বাধীন, ইলেকট্রা। মুক্তি আমার হৃদয়ে এসেছে বজ্রনির্ঘোষে।

ইলেকট্রা ॥ মুক্ত! আমার তো নিজেকে মুক্ত মনে হচ্ছে না। আর তুমি—তুমি কি যা ঘটেছে তাকে মুছে ফেলতে

পারো! কিছু একটা ঘটেছে আর তা মুছে ফেলার স্বাধীনতা আমাদের কারো নেই। আমরা-যে মাতৃহন্তা এ নির্মম সত্যটাকে তুমি মুছে ফেলতে পারো?

অরেস্টিস ॥ তুমি কি বিশ্বাস করো আমি তা মুছে ফেলতে চাই! আমি আমার কাজ করেছি—আর সে-কাজটা ছিল অনিবার্যরূপে সঙ্গত। আর আমি তা বহন করব খেয়ানৌকা যেমন যাত্রীদের বয়ে নিয়ে যায় ওপারে। আমিও ওপারে পৌঁছেই হিশেব করব! বোঝার ভার যত বেশি হবে, আমি ততই খুশি হব। কেননা, আমার বোঝাটাই আমার মুক্তি। এই গতকালও আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলেছি। হাজারও পথ আমি মাড়িয়েছি—কিন্তু চলাই কেবল সার হয়েছে—কারণ সেগুলো ছিল অন্য মানুষের পথ। হ্যাঁ, সব পথেই হেঁটেছি আমি—নদীর ধারে গুণটানা পথ—কিংবা গাধার চলার মতো চিকন পাহাড়ি পথ, এমনকি প্রশস্ত রাজপথও। কিন্তু তার একটিও আমার ছিল না। আজ আমার সামনে একটিমাত্র পথ। ঈশ্বর জানেন এ-পথ কোথায় নিয়ে যাবে আমায়! কিন্তু এ একান্তই আমার পথ। কী হল তোমার ইলেকট্রা!

ইলেকট্রা ॥ আমি তোমায় আর দেখতে পাচ্ছিনে! ওই মশালে আর কোনো আলো নেই। আমি কেবল তোমার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। সে-কণ্ঠ শাণিত ক্ষুরের মতো কাটছে। এ আঁধার কি সবসময়ই থাকবে? দিনের বেলাতেও কি থাকবে এ অন্ধকার! আহ্, অরেস্টিস, ওই-যে ওরা আসছে!

অরেস্টিস ঃ কারা?

ইলেকট্রা ঃ ঐ যে! কিন্তু কোত্থেকে এল ওরা। ওই দ্যাখ মাথার ওপরে দেয়ালে কেমন কালো কালো আঙুরের মতো। ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসছে ওরা। মশালের আলোটাকে ঢেকে দিচ্ছে। ওদের ছায়ার জন্যই তোমার মুখটাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি।

অরেস্টিস ঃ মাছি!

ইলেকট্রা ঃ ঐ শোনো পাখার শব্দ কেমন হাঁপরের গর্জনের মতোন। অরেস্টিস, ওরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে! ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে আসবে আমাদের উপর। আমি ওদের হাজার হাজার আঠালো পা আমার গায়ে অনুভব করব। কোথায় পালাবে, অরেস্টিস! ওরা বড় হচ্ছে, ক্রমশ বড় হচ্ছে। এখন দেখতে কেমন মৌমাছির মতো হয়েছে, দ্যাখো। ওরা আমাদের ঘিরে রাখবে ঘূর্ণায়মান মেঘবলয়ের মতো। উহ্ কী ভয়ঙ্কর! আমি ওদের চোখ, লক্ষ লক্ষ চোখ দেখতে পাচ্ছি—আমাদের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে।

অরেস্টিস ঃ মাছি আমাদের কী করবে।

ইলেকট্রা ঃ অরেস্টিস, ওরা প্রতিহিংসা—অনুশোচনার দেবী।

জনকণ্ঠ ঃ *[দরজার ওপারে থেকে]* খোলো—খোলো—না খুললে দরজা ভেঙে ঢুকব আমরা।

*[দরজায় দুদ্দাড় শব্দ। প্রবল করাঘাত]*

অরেস্টিস ঃ নিশ্চয়ই ক্লাইটেমনেস্ট্রার আর্তচিৎকারে আকৃষ্ট হয়েছে ওরা! এসো, আমায় এ্যাপোলোর মন্দিরে নিয়ে চল। রাতটা ওখানেই কাটাব মানুষ আর মাছির হাত থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে। আর কাল সকালে ওদের সঙ্গে কথা বলব।

## তৃতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

এ্যাপোলোর মন্দির। গোধূলি। মঞ্চের মাঝখানে এ্যাপোলোর মূর্তি।
মূর্তির পাদদেশে অরেস্টিস ও ইলেকট্রা নিদ্রিত, ওদের হাত মূর্তির পা জড়িয়ে।
প্রতিহিংসার দেবীরা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে ঘুমোয় হাড়গিলার মতো।
পেছনে বিরাট ব্রোঞ্জের দুয়ার।

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ *[হাই তুলে]* আ-হ-হ্! রাতটা ঘুমিয়েছি পায়ের উপর ঠায় দাঁড়িয়ে, রাগে টানটান হয়ে—স্বপ্নও দেখেছি বিপুল ক্রোধের। আহ্, ক্রোধের ফুল কী সুন্দর। আমার হৃদয়ের লাল ফুল *[অরেস্টিস ও ইলেকট্রার চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে]* ওরা ঘুমুচ্ছে। কী শুভ্র আর কোমল ওদের দেহ! আমি ওদের পেট আর বুকের উপর গড়াগড়ি দেব পাথরের উপর পাহাড়ি ঝর্নার মতো। আর আমি ওদের নরম মাংস পরম ধৈর্যের সাথে কুরে কুরে খাব, চেটেপুটে খাব—একেবারে হাড় পর্যন্ত মসৃণ করে দেব। *[কয়েক পা এগিয়ে]* হে ঘৃণার সকাল—শ্বেতশুভ্র, হেমময় প্রভাত! কী অপূর্ব জাগরণ। ওরা ঘুমুচ্ছে—ঘামে ভেজা, সোঁদা গন্ধ উঠছে ওদের গা থেকে। কিন্তু আমি জেগে আছি—সজীব অথচ কঠোর আমার হৃদয়ে পাষাণ, অনুভূতিতে পবিত্রতা।

ইলেকট্রা ॥ *[ঘুমের মধ্যে]* হায়!

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ ও বিলাপ করছে। রসো সুন্দরী, এখনি বুঝতে পারবে আমাদের দাঁতের ধার কত! আমাদের সোহাগে অতিষ্ঠ হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই যন্ত্রণায় চিৎকার করবে। আমি তোমায় বলবান পুরুষের মতো প্রেম দেব, কারণ তুমি আমার দয়িতা। আমার প্রেমের ভার তুমি বুঝতে পারবে। তুমি নিঃসন্দেহে সুন্দরী ইলেকট্রা, আমার চেয়ে সুন্দরী। কিন্তু তুমি দেখবে আমার চুমু তোমাকে কেমন বুড়িয়ে দেয়। ছয় মাসের মধ্যে আমি তোমায় থুত্থুড়ে বুড়িতে পরিণত করব। কিন্তু আমি চিরযৌবনা। *[ওদের উপর ঝুঁকে]* আজ কী সুন্দর পচনশীল শিকার—খেতে কী মজা হবে। আমি যতই ওদের দিকে তাকাচ্ছি, যতই ওদের উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করছি ততই একটা দুর্বিনীত ক্রোধে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। ওহ্ কী অপূর্ব মিষ্টি এই ঘৃণার সকাল—যা আগুনের মতো রক্তে ছড়িয়ে পড়ছে—কী মিষ্টি তীক্ষ্ণ নখর ও দাঁত নিয়ে এই প্রতীক্ষা! ঘৃণা আমার সমস্ত সত্তাকে প্লাবিত করছে। আমার কণ্ঠরোধ করছে—আমার বুকে উঠে আসছে দুধের মতো। হে ভগিনীরা, ওঠো, সকাল হয়েছে, উঠে পড়ো।

দ্বিতীয় প্রতিহিংসা ॥ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম আমি যেন ওদের খাচ্ছি!

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ আহ্ অত অধৈর্য হয়ো না। আজ ওরা দেবতার হেফাজতে আছে কিন্তু শিগগিরই ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে ওরাও মন্দির-চত্বরের বাইরে যেতে বাধ্য হবে। আর আমি খুব মজা করে খেতে পারব ওদের।

তৃতীয় প্রতিহিংসা ॥ আহ্! নখ দিয়ে খুবলে নিতে কী ইচ্ছেই না করছে।

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ আরে রসো। কিছুক্ষণ পরেই তোমাদের লৌহনখর ওই নবীন অপরাধীদের কাঁচা মাংসে হাজারটা লাল পথ কেটে নেবে। কাছে এসো, ভগিনীরা, আরো কাছে এসো, চেয়ে দ্যাখো ওদের।

জনৈক প্রতিহিংসা ॥ আহ্ কী কচি ওরা!

অন্য প্রতিহিংসা ॥ আহ্ কী সুন্দর!

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ এসো সবাই মিলে আনন্দ করো। অপরাধীরা প্রায়ই হয়ে থাকে বৃদ্ধা এবং কুৎসিত। সুন্দরকে ধ্বংস করার এমন বিরল সুযোগ খুব কমই মিলে!

প্রতিহিংসারা সমস্বরে ॥ হেইআ! হেইআ।

তৃতীয় প্রতিহিংসা ॥ অরেস্টিস তো বলতে গেলে শিশুই। ওর প্রতি আমার ঘৃণায় থাকবে মাতৃত্বের কোমলতা। আমি ওর পাণ্ডুর মাথাটি আমার হাঁটুতে রেখে তার চুলে বিলি কেটে দেব।

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ তারপর?

তৃতীয় প্রতিহিংসা ॥ তারপর হঠাৎ করে ওর চোখদুটিতে আমার লম্বা নখ দুটো বসিয়ে দেব।

*[সকলের পৈশাচিক অট্টহাসি]*

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ দ্যাখ, ওরা জাগছে—কেমন হাত-পা টান টান করে হাই তুলছে। এসো বোনেরা সব, এসো গান গেয়ে আমরা অপরাধীদের ঘুম থেকে জাগাই।

প্রতিহিংসারা ॥ *[সমবেত কণ্ঠে]* জ-জ-জ-জ-জ

কলজে পচা কলজে
মিষ্টি কলজে,
রসালো কলজে
তোমাদের কলজেতে বসব
বসব আমরা বসব
মাছিরা যেমন থাকে মাখনে

মৌমাছি ফুলে উপবনে
আমরা তেমন আছি তোমাদের প্রাণে
নেব শুষে পুঁজ বাটি বাটি
হবে তা সবুজ মধু খাঁটি
ঘৃণা ছাড়া আর কোনো প্রেম বাজে কানে
পুলকে শিহরে প্রাণে প্রাণে
জ-জ-জ-জ-জ
কলজে, পচা কলজে।

বাড়িগুলির অপলক দৃষ্টি হব
শিকারি কুকুরের তীক্ষ্ণ দন্ত হব
পাখার ভন ভন
অরণ্য শন শন
কন কন ঠক ঠক
ভট ভট ধক ধক
হেইয়ো হেইয়ো জ-জ-জ-জ
হেইয়ো হেইয়ো জ-জ-জ-জ-জ।

যতদিন না হবি মরে ভূত
কীটের খাবার কিবা কিম্ভূত
ততদিন চিরদিন থাকব
তোদের সঙ্গে মোরা থাকব।

আমরা মাছি চিরদিন আছি
তোমাদের সঙ্গে সব ভাগ করে নেব
চোখ থেকে আলো নেব
মুখ থেকে ভাত নেব।

*[ওরা নৃত্য করে]*

ইলেকট্রা ॥ *[অর্ধজাগরণে]* কে, কে কী বলল! কে তোমরা?

প্রতিহিংসা ঃ জ-জ-জ-জ-জ-জ।

ইলেকট্রা ঃ ও হ্যাঁ, তোমরা। আমরা কি সত্যি ওদের খুন করেছি?

অরেস্টিস ঃ *[জেগে ওঠে]* ইলেকট্রা!

ইলেকট্রা ঃ কে, কে তুমি? ও হ্যাঁ, অরেস্টিস, যাও চলে যাও।

অরেস্টিস ঃ কিন্তু, ব্যাপার কী ইলেকট্রা?

ইলেকট্রা ঃ তোমাকে দেখলে আমার ভয় করে। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। মা যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছে, রক্তাপ্লুত প্রাসাদের দুয়ারগুলোর নিচ দিয়ে রক্ত বয়ে যাচ্ছে। এই ধরে দ্যাখো, আমার হাত কেমন ঠাণ্ডা। না, না, ছেড়ে দাও। আমায় স্পর্শ কোরো না। মায়ের কি প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল?

অরেস্টিস ঃ চুপ করো!

ইলেকট্রা ঃ *[পুরোপুরি জেগে উঠে]* এসো তোমায় ভালো করে দেখি। তুমি ওদের দুজনকে হত্যা করেছ। তুমি—তুমিই ওদের হত্যা করেছ। তুমি এখানে আমার পাশে দাঁড়িয়ে—সদ্য ঘুম থেকে জেগে উঠেছ, তোমার মুখে কোনো চিহ্ন নেই, অথচ তুমি ওদের হত্যা করেছ!

অরেস্টিস ঃ হ্যাঁ, আমি ওদের হত্যা করেছি। *[নীরব থেকে]* তোমাকে দেখেও আমি ভয় পাচ্ছি। গতকাল তুমি এত সুন্দর ছিলে। আর আজ মনে হচ্ছে কোনো হিংস্র পশু যেন তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে তোমার মুখকে বিকৃত করে দিয়েছে।

ইলেকট্রা ঃ না, কোনো হিংস্র পশু নয়। তোমার অপরাধ। তোমার অপরাধই আমার চোখের পাতা আর গণ্ডদেশকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার দাঁত আর চোখ যেন মাংসহীন, নগ্ন। কিন্তু এই ওরা কারা?

অরেস্টিস ॥ ওদের দিকে তাকিয়ো না। ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ ক্ষতি করতে পারব না। ওকে একবার আমাদের মাঝে আসতে বল। তারপর বুঝবে কত ধানে কত চাল।

অরেস্টিস ॥ চুপ কর্! তোদের গর্তে যা কুত্তীর দল। *[প্রতিহিংসারা তর্জন গর্জন করে]* গতকাল শুভ্রবসনা যে-মেয়েটি মন্দির-সোপানে নাচছিল তুমি সেই মেয়ে?

ইলেকট্রা ॥ আমি একরাতেই বুড়িয়ে গেছি।

অরেস্টিস ॥ না, তুমি এখনও সুন্দর, কিন্তু ওই চোখদুটো তুমি কোথায় পেলে? ইলেকট্রা...তুমি তাঁর মতো...ক্লাইটেমনেস্ট্রার মতো। ওকে হত্যা করে কী লাভ হল তবে। তুমি দেখতে অবিকল মায়ের মতো, আমার অপরাধকে তোমার চোখে যখন নাচতে দেখি তখন আমার ভয় হয়!

ইলেকট্রা ॥ ভয় তো সেও করত তোমাকে।

অরেস্টিস ॥ সত্যি! সত্যি কি আমাকে দেখে তোমার ভয় হয়!

ইলেকট্রা ॥ আমাকে একা থাকতে দাও।

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ তবেই বোঝো! তোমার কি আর-কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? ও তোমাকে ঘৃণা করবে না কেন! বেচারি ছিল সুখে—সুখস্বপ্ন নিয়ে—হুট করে কোত্থেকে তুমি এসে নিয়ে এলে খুনখারাবি আর পাপ। তাইতো বাপু ওকে সে পাপের ভাগী হতে হচ্ছে। আর তাতেই না ওই বেদিতে নিতে হয়েছে আশ্রয় যা কিনা তার শেষ ভরসা।

অরেস্টিস ॥ ওদের কথা শুনো না।

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ সরে যাও, সরে যাও। ইলেকট্রা ওকে ছুঁতে দিও না তোমায়। ও একটা কসাই। ওর হাতে রক্তের

গন্ধ। ও বৃদ্ধা রানীকে স্থূলহাতে কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে হত্যা করেছে।

ইলেকট্রা ॥ মিথ্যা। মিথ্যা বলছ তোমরা।

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ আমায় স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করতে পারো। আমি সারাক্ষণ ওখানে ছিলাম—ওদের চারপাশে ভনভন করছিলাম।

ইলেকট্রা ॥ সে তাহলে বারবার কুপিয়ে হত্যা করেছে মাকে।

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ কম করে হলেও দশবার আঘাত করেছে। প্রতিবারই ও চেয়েছে হাত দিয়ে মুখ আর পেট আড়াল করতে, আর অরেস্টিস সে হাতকেই কুপিয়ে কুচি কুচি করেছে।

ইলেকট্রা ॥ মা তাহলে কষ্ট পেয়ে মরেছে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়নি তাঁর।

অরেস্টিস ॥ তোমার কানে আঙুল দাও ইলেকট্রা। ওদের কথায় কান দিও না, ওদের দিকে তাকিয়ো না—এমনকি প্রশ্নও কোরো না। প্রশ্ন করেছ কি মরেছ।

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ হ্যাঁ, ও খুব কষ্ট পেয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মরেছে।

ইলেকট্রা ॥ *[মুখ ঢেকে]* উফ!

অরেস্টিস ॥ ওরা আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। তোমার চারপাশে ওই ডাইনি গড়ে তুলছে নীরবতার দেয়াল। কিন্তু হুঁশিয়ার, একবার তুমি একাকিনী হয়ে গেলেই হবে অসহায় আর তখনই ওরা তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইলেকট্রা, এ খুন আমরা ঠাণ্ডা মাথায় করেছি—এর বোঝা আমরা একত্রে বইব।

ইলেকট্রা ॥ তুমি বলছ এ হত্যা আমি কামনা করেছিলাম!

অরেস্টিস ॥ কথাটা তো মিথ্যে নয়, ইলেকট্রা।

ইলেকট্রা ॥ আলবত মিথ্যা! কিন্তু...হয়তো সত্যি। না, আমি

ভাবতে পারছি না। হ্যাঁ, এই অপরাধের স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম সত্যি। কিন্তু হত্যা তো করেছ তুমি—তুমি মাকে খুন করেছ! তুমি মায়ের খুনি।

প্রতিহিংসা ॥ *[অট্টহাসি]* খুনি! কসাই!

অরেস্টিস ॥ ইলেকট্রা ওই দুয়ারের ওপাশে রয়েছে পৃথিবী—মুক্ত পৃথিবী ও সুন্দর প্রভাত। বাইরে সূর্য উঠছে—রাজপথ ঝলসে উঠছে সে আলোয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এ জায়গা ছেড়ে যাব। বাইরে রৌদ্রস্নাত ঐ পথে বিচরণ করব। আর তখনই এই বুড়ি প্রতিহিংসারা নির্জীব হয়ে পড়বে। রৌদ্রালোক ওদের গায়ে সুতীক্ষ্ণ ফলার মতো বিঁধবে।

ইলেকট্রা ॥ সূর্য!

প্রতিহিংসা ॥ ইলেকট্রা, সূর্যকে তুমি আর কখনও দেখতে পাবে না। পঙ্গপালের মতো তোমাদের চারপাশে ভিড় করে সূর্যকে ঢেকে দেব। যেখানেই যাও তোমার চারপাশে একরাশ অন্ধকার নিয়েই তুমি পথ চলবে।

ইলেকট্রা ॥ উহ্ আমাকে একা থাকতে দাও। অসহ্য এ যন্ত্রণা!

অরেস্টিস ॥ তোমার দুর্বলতাই ওদের শক্তি যোগাচ্ছে। চেয়ে দ্যাখো ওরা আমার সঙ্গে কথা বলার সাহস পায় না। শোনো একটা সংজ্ঞাহীন ভীতি তোমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে আর তা তোমাকে বিচ্ছিন্ন করছে আমার কাছ থেকে। কিন্তু তুমি এমন কী সয়েছ যা আমি সইনি! তুমি কি ভাবো মায়ের আর্তচিৎকারের অনুরণন আমার কানে কোনোদিন থামবে? আর মায়ের পাণ্ডুর মুখে বিরাট চোখদুটো—সীমাহীন দুঃখের সাগর ঐ চোখদুটো কোনোদিন আমার চোখের আড়াল হবে? আর যে-যন্ত্রণা তোমার আত্মাকে নিয়ত দহন করছে—সে-আগুন আমার হৃদয়ে

কোনোদিন কি নিব্‌বে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। আমি মুক্ত। সকল স্মৃতি আর দুঃখ-যন্ত্রণার উর্ধ্বে। মুক্ত, স্বাধীন আপনার মাঝে সংস্থিত। নিজেকে ঘৃণা করার কোনো প্রয়োজন নেই, ইলেকট্রা। এসো আমার হাতে হাত রাখো। আমি কোনোদিন তোমায় ছেড়ে যাব না!

ইলেকট্রা ॥ হাত ছাড়ো বলছি। এই বিকট হায়েনাগুলো আমার প্রাণে ভীতি সঞ্চার করে ঠিকই, কিন্তু তোমাকে আমি তার চেয়েও বেশি ভয় পাই।

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ আহা সে তো বটেই। সে তো অবশ্যই ঠিক। আলবত ঠিক। পুতুল রানী, ওর চেয়ে আমাদের অবশ্যই কম ভয় পাও তুমি। কারণ আমাদের তোমাকে বড় প্রয়োজন ইলেকট্রা। তুমি আমাদের সন্তান, ·আমাদের সোনামণি। আমাদের নখ ছাড়া তোমার চামড়া বিদীর্ণ করবে কিসে, আমাদের দাঁত ছাড়া তোমার সুডৌল বক্ষে কামড় দেবে কে? আর আমাদের প্রবল আদিম প্রেম ছাড়া তোমাকে তোমার ঘৃণার হাত থেকে বাঁচাবে কিসে? তোমার দেহের পীড়নই পারে তোমার যন্ত্রণাকাতর হৃদয় থেকে তোমার মনকে ফেরাতে। সুতরাং এসো আমরা তোমাকে পীড়ন করি। ঐ সোপান দুটো অতিক্রম করো তাহলেই আমরা তোমাকে দুহাত বাড়িয়ে কোলে নেব। আমাদের চুম্বন যখন তোমার কোমল মাংসকে দীর্ণ করবে, তখন যন্ত্রণার আগুনে তুমি সব বিস্মৃত হবে।

প্রতিহিংসারা ॥ এসো, এসো। নেমে এসো।

*[ওরা নাচতে থাকে, ধীরে ধীরে, ঘুরে ঘুরে। ইলেকট্রা সম্মোহিতের মতো এগুতে যায়।]*

কোনোদিন কি নিব্‌বে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। আমি মুক্ত। সকল স্মৃতি আর দুঃখ-যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে। মুক্ত, স্বাধীন আপনার মাঝে সংস্থিত। নিজেকে ঘৃণা করার কোনো প্রয়োজন নেই, ইলেকট্রা। এসো আমার হাতে হাত রাখো। আমি কোনোদিন তোমায় ছেড়ে যাব না!

ইলেকট্রা ॥ হাত ছাড়ো বলছি। এই বিকট হায়েনাগুলো আমার প্রাণে ভীতি সঞ্চার করে ঠিকই, কিন্তু তোমাকে আমি তার চেয়েও বেশি ভয় পাই।

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ আহা সে তো বটেই। সে তো অবশ্যই ঠিক। আলবত ঠিক। পুতুল রানী, ওর চেয়ে আমাদের অবশ্যই কম ভয় পাও তুমি। কারণ আমাদের তোমাকে বড় প্রয়োজন ইলেকট্রা। তুমি আমাদের সন্তান, ·আমাদের সোনামণি। আমাদের নখ ছাড়া তোমার চামড়া বিদীর্ণ করবে কিসে, আমাদের দাঁত ছাড়া তোমার সুডৌল বক্ষে কামড় দেবে কে? আর আমাদের প্রবল আদিম প্রেম ছাড়া তোমাকে তোমার ঘৃণার হাত থেকে বাঁচাবে কিসে? তোমার দেহের পীড়নই পারে তোমার যন্ত্রণাকাতর হৃদয় থেকে তোমার মনকে ফেরাতে। সুতরাং এসো আমরা তোমাকে পীড়ন করি। ঐ সোপান দুটো অতিক্রম করো তাহলেই আমরা তোমাকে দুহাত বাড়িয়ে কোলে নেব। আমাদের চুম্বন যখন তোমার কোমল মাংসকে দীর্ণ করবে, তখন যন্ত্রণার আগুনে তুমি সব বিস্মৃত হবে।

প্রতিহিংসারা ॥ এসো, এসো। নেমে এসো।

*[ওরা নাচতে থাকে, ধীরে ধীরে, ঘুরে ঘুরে। ইলেকট্রা সম্মোহিতের মতো এগুতে যায়।]*

অরেস্টিস ॥ *[ওর হাত ধরে]* যেও না, না, না, দোহাই তোমার ওদের কাছে নয়। একবার ওরা তোমায় পেলে সব শেষ হয়ে যাবে।

ইলেকট্রা ॥ *[সজোরে হাত ছাড়িয়ে]* হাত ছাড়ো। আমি তোমায় ঘৃণা করি। *[ইলেকট্রা সিঁড়ি বেয়ে নামে, আর তখনই প্রতিহিংসারা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে]* বাঁচাও!

*[জীয়ূসের প্রবেশ]*

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[এই দৃশ্য—জীয়ূস]

জীয়ূস ॥ যা তোদের গর্তে যা!

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ প্রভু!

*[প্রতিহিংসারা অনিচ্ছায় ইলেকট্রাকে মাটিতে রেখে দূরে সরে যায়।]*

জীয়ূস ॥ আহা বাছারা! তোমাদের শেষে এই পরিণতি! আমার হৃদয় একদিকে ক্রোধ আর অন্যদিকে করুণায় উদ্বেল হচ্ছে। ওঠো ইলেকট্রা। আমি যতক্ষণ এখানে রয়েছি ততক্ষণ প্রতিহিংসারা কোনো ক্ষতি করবে না। *[জীয়ূস ইলেকট্রাকে উঠতে সাহায্য করে এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে]* আহা, কী নিদারুণ পরিবর্তন! এক রাতে, মাত্র এক রাতে তোমার গালের ওই সোনালি আভা মিলিয়ে গেছে! এক রাতে তোমার শরীর ভেঙে গেছে—ফুসফুস, পিত্ত, কলজে সব পুড়ে খাক হয়ে গেছে। ওই উদ্ধত যুবকের

অহঙ্কার তোমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে একবার ভেবে দ্যাখো!

অরেস্টিস ॥ ওহে, তোমার ঐ মিহি ঢঙে কথা বলা ছাড়ো দেখি! দেবতাদের রাজার পক্ষে ঐ সুরে কথা বলা মানায় না।

জীয়ূস ॥ আর তুমিও এ উদ্ধত সুর ছাড়ো। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রত্যাশী অপরাধীরও ঐ সুরে কথা বলা সাজে না।

অরেস্টিস ॥ আমি অপরাধী নই—আমি যে-কাজকে অপরাধ ভাবি না সে-কাজের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে দিয়ে তুমি করাতে পারবে না।

জীয়ূস ॥ হয়তো তোমার ভুল হচ্ছে, কিন্তু দাঁড়াও! এখুনি তোমার ঐ ভুল ভাঙাচ্ছি!

অরেস্টিস ॥ যত খুশি অত্যাচার করো আমায়, কিন্তু আমার কোনো অনুশোচনা নেই।

জীয়ূস ॥ বোনের জন্য যে দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছ, তার জন্যও না?

অরেস্টিস ॥ না, তার জন্যও না।

জীয়ূস ॥ ইলেকট্রা, শোনো, কান পেতে শোনো। এই লোকটাই না তোমাকে ভালোবাসে বলছিল।

অরেস্টিস ॥ আমি ওকে নিজের চাইতে বেশি ভালোবাসি। কিন্তু ওর দুঃখবোধ আসছে ওর অন্তর থেকে আর কেবল ও-ই পারে নিজেকে নিজের এ দুঃখ থেকে রেহাই দিতে। কারণ ও মুক্ত, স্বাধীন।

জীয়ূস ॥ আর তুমি! তুমি নিজেও স্বাধীন নিশ্চয়ই।

অরেস্টিস ॥ হ্যাঁ, আর সেটা তুমি ভালো করেই জান।

জীয়ূস ॥ শোনো উদ্ধত নির্বোধ যুবক। একদল ডালকুত্তা পরিবৃত হয়ে দেবতার দুপায়ের মাঝখানে গুটিসুটি মেরে বসে থেকে এ তোমার বাহাদুরিই বটে। মুক্তি

নিয়ে এতই যদি বড়াই তোমার, তবে একজন শৃঙ্খলিত কয়েদি কিংবা ক্রুশবিদ্ধ ক্রীতদাসের মুক্তির প্রশংসা কর না কেন।

অরেস্টিস ॥ আলবত করব, কেন করব না।

জীয়ূস ॥ ধীরে যুবক, ধীরে! আপোলো তোমায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছে বলেই এত বড়াই! কিন্তু আপোলো আমার বড়ই অনুগত ভৃত্য। আমার সামান্যতম আঙুলের ইশারায় সে তোমায় পরিত্যাগ করবে।

অরেস্টিস ॥ তা অপেক্ষা কিসের! আঙুল কেন গোটা হাতটা তুলেই ইশারা করো না।

জীয়ূস ॥ তাতে লাভ কী? তোমায় না বলেছি শাস্তি দিতে আমি ঘৃণা করি। আমি তোমাদের দুজনকেই বাঁচাতে এসেছি।

অরেস্টিস ॥ আমাদের বাঁচাতে। পরিহাস রাখো হে মৃত্যু আর প্রতিশোধের দেবতা। কারণ দেবতা হলেও অত্যাচারিতের সামনে মিথ্যা আশা তুলে ধরা অন্যায়!

জীয়ূস ॥ মিনিট-পনেরোর মধ্যে তুমি এখান থেকে বেরুতে পারবে।

অরেস্টিস ॥ নির্বিঘ্নে?

জীয়ূস ॥ আমি কথা দিচ্ছি পারবে!

অরেস্টিস ॥ কিন্তু প্রতিদানে কী চাও তুমি?

জীয়ূস ॥ আরে না, কিছু না, কিছু না!

ইলেকট্রা ॥ কিছু না। আমার শুনতে ভুল হয়নি তো। তাহলে তো দেবতা হিশেবে তুমি দয়ালু, প্রেমময়!

জীয়ূস ॥ যা চাই তা একেবারেই যৎসামান্য। বলতে পারো কিছুই না। খুব সহজে যা দিতে পার—একটুখানি অনুশোচনা।

অরেস্টিস ঃ হুঁশিয়ার ইলেকট্রা! ওই কিছু-না-টুকুই তোমার হৃদয়ে পর্বতপ্রমাণ বোঝা হয়ে চাপবে।

জীয়ূস ঃ *[ইলেকট্রার প্রতি]* ওর কথা শুনো না। বরং আমার প্রশ্নের জবাব দাও! তুমি এ অপরাধকে অস্বীকার করছ না কেন? এ অপরাধ করেছে অন্য একজন। তোমাকে সঠিক অর্থে তো খুনের দোসর বলা যায় না।

অরেস্টিস ঃ ইলেকট্রা ওর কথায় তুমি কি দীর্ঘ পনেরো বছরের ঘৃণা আর আশাকে ভুলে যাবে?

জীয়ূস ঃ ভুলে যাবার কথা অবান্তর। ও তো এ নৃশংস অপরাধের ইচ্ছাই মনে পোষণ করেনি কোনোদিন।

ইলেকট্রা ঃ হায় এ যদি সত্যি হত।

জীয়ূস ঃ অবশ্যই সত্যি। তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্বাস রাখতে পারো আমার কথায়। আমি যে অন্তর্যামী সে তো জানোই।

ইলেকট্রা ঃ *[অবিশ্বাসের সুরে]* এ অপরাধকে আমি কামনা করিনি, এই কি তুমি দেখতে পাচ্ছো আমার অন্তরে?

জীয়ূস ঃ বাহ্! তোমার ঐ রক্তাপ্লুত স্বপ্নগুলোতে তো একধরনের শিশুসুলভ সরলতা ছিল। এর ফলে তুমি তোমার বন্দিত্বকে ভুলতে পেরেছ, তোমার আহত আত্মাভিমানও তাতে খানিকটা প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে সেগুলো বাস্তবে সত্যি হোক এ তুমি কখনো চাওনি। কি, ঠিক বলিনি?

ইলেকট্রা ঃ আহা! দেবতা আমার, তাই যদি সত্যি হত!

জীয়ূস ঃ শোনো ইলেকট্রা। তুমি একেবারেই ছোট্ট একটি মেয়ে। তোমার বয়সের মেয়েরা ঐশ্বর্য কিংবা রূপ কামনা করে। কিন্তু তোমার বংশের এক রক্তাক্ত

নিয়তি তোমাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। তুমি স্বপ্ন দেখেছ অতি বিষণ্ন এক নৃশংস অপরাধিনী হতে। কিন্তু তুমি অমঙ্গল কামনা করনি, তুমি নিজের দুর্ভোগ কামনা করেছ। যে-বয়সে মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলে সে-বয়সে তোমার কোনো বন্ধু ছিল না, পুতুল ছিল না—তুমি খেলা করেছ হত্যার রক্তাপ্লুত স্বপ্ন নিয়ে, কারণ একাকী হলে ঐ ধরনের স্বপ্ন নিয়েই কেবল খেলা করা যায়।

ইলেকট্রা ॥ বলো! বলো! আমি এবার নিজেকে বুঝতে পারছি।

অরেস্টিস ॥ ইলেকট্রা, ইলেকট্রা! এই মুহূর্তে তুমি তোমার নিজের ওপর অপরাধ টেনে আনছ। তোমার মনে কী ইচ্ছা লুকিয়ে ছিল তা তুমি ছাড়া অন্য কেউ জানবে কী করে? সে-ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দিতে দেবে কি অন্য একজনকে? যে অতীত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না তাকে বিকৃত করা কেন? তোমার সেই রণচণ্ডিনী মূর্তিকে তুমি পরিহার করছ কেন, কেন তোমার সেই ঘৃণায় উদ্ভাসিত দেবীমূর্তি যাকে আমি ভালোবাসি তাকে পরিহার করছ? বুঝতে পারছ না এই নিষ্ঠুর দেবতা তোমাকে নিয়ে খেলছে?

জীয়ূস ॥ না, ইলেকট্রা আমি মোটেই তোমায় নিয়ে খেলছি না। আর শোনো আমি তোমাদের কী দিতে চাই! তোমরা যদি এ অপরাধকে অস্বীকার কর তবে আমি তোমাদের দুজনকেই আরগোসের সিংহাসনে বসাব।

অরেস্টিস ॥ ঐ আমরা যাদের হত্যা করেছি তাদের জায়গায়?

জীয়ূস ॥ হ্যাঁ, তাই!

অরেস্টিস ॥ এবং আমাকে ঐ পোশাকগুলো পরিধান করতে হবে যেগুলোতে এখন মৃত রাজার গায়ের উত্তাপ লেগে আছে।

জীয়ূস ঃ সেটা অথবা অন্য কিছু। তাতে কী আসে যায়?

অরেস্টিস ঃ কিছুই আসে যায় না, যতক্ষণ-না তা কালো ছাড়া অন্য কোনো রঙ হবে, তাই না?

জীয়ুস ঃ কেন, তুমি কি শোকব্রত পালন করছ না?

অরেস্টিস ঃ ও ভুলেই গেছিলাম, মায়ের জন্য শোক পালন করছি। আর আমার প্রজারা তাদেরও কি কালো পোশাক পরিধান করতে হবে?

জীয়ূস ঃ তারা তো এরই মধ্যে কালো পোশাক পরেই আছে।

অরেস্টিস ঃ তাই নাকি! ওদের তো তাহলে পুরনো কাপড়গুলো না ছেঁড়া পর্যন্ত সময় দিতে হয়।...তা বুঝতে পেরেছ তো ইলেকট্রা! যদি তুমি দুফোঁটা চোখের পানি ফ্যালো তবে ক্লাইটেমনেস্ট্রার ঐ ময়লা অন্তর্বাস যা তুমি পনেরো বছর যাবত ধুয়েছ তা তোমাকে পরতে দেওয়া হবে। আর রানীর ভূমিকায় অভিনয় তুমি চাইলেই পেয়ে যাবে। আর মায়ের মতো দেখতে বলে তোমার সে-অভিনয়ও চমৎকার হবে। সবাই তোমাকে মা বলেই ভাববে। কিন্তু আমার শুচিবাই আছে—ঐ ভাঁড়টার ময়লা কাপড়গুলো আমি পরতে পারব না।

জীয়ূস ঃ বড্ড বড়াই করো হে ছোকরা তুমি! তুমি দু-দুটো জলজ্যান্ত নিরস্ত্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে হত্যা করেছ। কিন্তু তোমার কথা শুনলে মনে হয় তুমি একদল মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমাদের নগরীর ত্রাণকর্তা হয়ে ফিরে এসেছ!

অরেস্টিস ঃ কী জানি, হয়তো তাই হয়ে এসেছি!

জীয়ূস ঃ তুমি, ত্রাণকর্তা! এই দুয়ারের ওপারে তোমার জন্য কী অপেক্ষা করছে জানো! আরগোসের সব অধিবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে

লাঠিসোঁটা আর পাথর নিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য। তুমি একজন কুষ্ঠরোগীর মতো পরিত্যক্ত, একাকী।

অরেস্টিস ॥ তাই!

জীয়ূস ॥ অত অহঙ্কার কোরো না যুবক! তোমাকে ওরা যে একাকীত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে তা হচ্ছে ঘৃণা আর ভীতির, বুঝলে হে কাপুরুষ খুনি!

অরেস্টিস ॥ কাপুরুষ খুনি হচ্ছে সে, যে অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হয়।

জীয়ূস ॥ অরেস্টিস আমি তোমায় সৃষ্টি করেছি, সৃষ্টি করেছি সব প্রাণীকে। দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো *[মন্দিরের দেয়াল ফাঁক হয়ে যায়, আকাশে ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হয়। জীয়ূস এই দৃশ্যপটের পেছনে দাঁড়ানো। তাঁর কণ্ঠ লাউডস্পিকারে উচ্চকিত হয় কিন্তু আবছা আলোতে তার ছায়ামাত্র চেনা যায়]* ঐ গ্রহগুলোর দিকে তাকাও—নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে, কখনো সরে যাচ্ছে না কিংবা ধাক্কা খাচ্ছে না। আমিই ওদের কক্ষপথ নির্ধারিত করে দিয়েছি ন্যায়নীতির সূত্রানুযায়ী। দূর আকাশের সঙ্গীত শুনতে পাও কি! একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনি হচ্ছে। *[সঙ্গীত]* প্রাণীরা তো যে-যার মতো, বংশবৃদ্ধি ঘটে সেও আমারই কর্ম। আমিই এ নিয়ম বেঁধে দিয়েছি যে মানুষের ঘরে মানুষ আর কুকুরের ঘরে কুকুর জন্ম নেবে। আমিই ঠিক করে দিয়েছি যে সাগরের জোয়ার শত জিহ্বা মেলে বালুবেলায় আছড়ে পড়বে, আবার নির্ধারিত লগ্নে ফিরে যাবে সাগরের বুকে। আমিই উদ্ভিদজগৎকে

প্রবৃদ্ধি দেই—আমারই নিঃশ্বাস বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয় তাদের পরাগরেণু। তুমিই তোমার নিকেতন হে আগন্তুক! এ পৃথিবীতে তোমার অবস্থান একটা পৃথকসত্তারূপে মাংসে বিঁধে-থাকা কাঁটার মতো কিংবা সামন্তপ্রভুর অরণ্যে অবৈধ শিকারির মতো। কারণ পৃথিবী মঙ্গলময়। আমি এই গ্রহটিকে আমার ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করেছি—আমিই মঙ্গল, আমিই কল্যাণ। কিন্তু অরেস্টিস তুমি অন্যায় করেছ—পাহাড় পর্বতের সবকিছু তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। মঙ্গল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—নির্ঝরের শীতল স্পর্শে, বেতবনের নমনীয়তায়, পাথরের পরতে পরতে কিংবা পাথরের ভারে। হ্যাঁ, তুমি মঙ্গলকে পাবে আগুনে আর আলোর অন্তরে। তোমার নিজের যে-শরীর তোমায় প্রতারণা করছে তাও আমার নিয়মে বাঁধা। মঙ্গল চৌদিকে, তোমার বাইরে, তোমার অন্তরে। তোমাকে দ্বিখণ্ডিত করছে কাঁচির মতো কিংবা পিষে ফেলছে পর্বতের ভার হয়ে। মহাসাগরের মতো এ তোমাকে আন্দোলিত করছে—তুলছে, ফেলছে—তোমার কু-পরিকল্পনাতেও এ ছিল। কারণ এ ছিল তোমার মশালের উজ্জ্বলতায়, তোমার তরবারির শাণিত ধারে। তোমার ডান বাহুর অমিত তেজে আর যে-অমঙ্গল নিয়ে তোমার এত অহঙ্কার—যাকে তুমি তোমার সৃষ্টি বলে দাবি করেছ তা একটা প্রচ্ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়—মঙ্গল না হলে যার কোনো অস্তিত্বই থাকত না। না, অরেস্টিস, ফিরে এসো, প্রকৃতিস্থ হও—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

তোমাকে অস্বীকার করছে, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে তুমি ত্রশরেণু মাত্র। প্রকৃতিতে ফিরে এসো প্রকৃতির অকৃতজ্ঞ সন্তান। নিজের পাপকে জানো, তাকে ঘৃণা করো, নিজের অন্তর থেকে উপড়ে ফ্যালো, যেমন করে মানুষ উপড়ে ফেলে নড়বড়ে দাঁতকে। তা না হলে সাবধান—তুমি যেদিকে যাবে সাগর দূরে সরে যাবে, নির্ঝর শুকিয়ে যাবে—তুমি যে-পথে যাবে সে-পথে পাথর গড়িয়ে পড়বে এবং মাটি ধসে পড়বে।

অরেস্টিস ॥ তবে তাই হোক! পর্বত আমাকে অস্বীকার করুক—ফুল শুকিয়ে যাক আমার স্পর্শে। তোমার সারা ব্রহ্মাণ্ডও আমাকে ভুল প্রমাণ করতে পারবে না। তুমি রাজা, তুমি দেবতা—পাথরের, নক্ষত্রের, তরঙ্গের, কিন্তু মানুষের তুমি দেবতা নও। *[দেয়াল জোড়া লেগে যায়। জীয়ূসকে স্পষ্ট দেখা যায়—ক্লান্ত শ্রান্ত—তার কণ্ঠ স্বাভাবিক হয়ে আসে]*

জীয়ূস ॥ বেয়াদপ, বেতমিজ! আমি তোমার রাজা নই—বেশ তবে কে তোমায় সৃষ্টি করেছে?

অরেস্টিস ॥ তুমি। কিন্তু তুমি ভুল করেছিলে—আমাকে তোমার স্বাধীনতা দেওয়া ঠিক হয়নি।

জীয়ূস ॥ আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলাম যাতে তুমি আমার অনুগত হও।

অরেস্টিস ॥ হয়তো-বা। কিন্তু এখন তা তোমার বিরুদ্ধে উদ্যত—এ ব্যাপারে কারো কিছু করার নেই—না তোমার, না আমার।

জীয়ুস ॥ আচ্ছা! এই তাহলে তোমার অজুহাত।

অরেস্টিস ॥ আমি তো কোনো অজুহাতে নিজের জন্য ক্ষমা চাইছি না।

জীয়ূস ॥ তা চাইছ না হয়তো। কিন্তু তোমার ঐ স্বাধীনতা, যার দাস বলে নিজেকে দাবি করছ তা অনেকটা অজুহাতের মতোই শোনাচ্ছে।

অরেস্টিস ॥ জীয়ূস আমি প্রভুও নই, ক্রীতদাসও নই। আমি আমার স্বাধীনতা, আমার মুক্তি। আমাকে সৃষ্টি করার পর থেকেই আমি আর তোমার নই।

ইলেকট্রা ॥ পিতার পুণ্যস্মৃতির কসম দিয়ে বলছি, অরেস্টিস, তুমি তোমার পাপের সঙ্গে আর অধর্ম যোগ কোরো না।

জীয়ূস ॥ ওর কথা শোনো যুবক। এসব যুক্তি দিয়ে ওকে আর ফেরাবার আশা বৃথা। এ-ভাষাও তার কানে নতুন আর বেশ অপ্রিয়ও বটে।

অরেস্টিস ॥ আমার কানেও তাই। আমার ফুসফুস, যা থেকে শব্দাবলি নিঃসৃত হচ্ছে; আমার জিহবা, যা সে-শব্দকে উচ্চারণ করছে—তাদের কাছেও এ নূতন। সত্যি কথা বলতে কী আমি নিজেকে, নিজেকে আর বুঝতে পারছি না, চিনতে পারছি না। গতকালও তুমি ছিলে আমার চোখে পর্দার মতো, আমার কানে জমানো মোমের মতো—গতকাল আমার একটা অজুহাত ছিল। বেঁচে থাকার তুমি ছিলে আমার অজুহাত। কারণ জগতে তুমিই আমায় সৃষ্টি করেছ তোমার কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য, আর এ-জগৎটা একটা বুড়ো ফেরিঅলার মতো রাত দিন তোমার মঙ্গলের জয়গান করেছে আমার কাছে। আর ঠিক তারপরই তুমি আমায় পরিত্যাগ করেছ।

জীয়ূস ॥ পরিত্যাগ করেছি তোমাকে! সে কেমন?

অরেস্টিস ॥ গতকাল আমি যখন ইলেকট্রার সঙ্গে, তখনও আমি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ করেছি—তোমার

সৃষ্টি এই প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতি মঙ্গলের জয়গান করেছে—তোমার মঙ্গলের—মায়াবী কণ্ঠে, হাজার পয়গাম নিয়ে এসেছে। আমাকে সৌজন্যবোধে অভিষিক্ত করার জন্যে একটা তীব্র আলো প্রেমিকের চোখের আলোর মতো নরম হয়েছে। আমাকে কৃত অপরাধের ক্ষমা চাইতে শেখানোর জন্য আকাশ যাজকের মুখের মতোই হয়েছে সৌম্য। তোমার ইচ্ছার অনুগত হয়ে আমার যৌবন জেগে উঠল আর সেই অসহায়া মেয়েটির মতোই অনুনয় করল যে তার প্রেমাস্পদের চলে যাবার ভয়ে ভীতা। সেই শেষবারের মতো আমি আমার যৌবনকে দেখেছি। হঠাৎ নীল আকাশ ফুঁড়ে নেমে আসল স্বাধীনতা, আসল মুক্তি আর আমার সমস্ত কিছু নিঃশেষে কেড়ে নিল। প্রকৃতি ভয়ে পিছু হটে গেল—যৌবন গেল হারিয়ে আর আমি নিজেকে অনুভব করলাম একাকী—ভীষণ একাকী তোমার এই ছোট্ট ব্রহ্মাণ্ডে। আমি ছিলাম যেন সেই মানুষটির মতো যে নিজের ছায়াকে হারিয়ে ফেলেছে। আমার মাথার উপরে কেউই থাকল না—ন্যায় অন্যায় কিছু না—আমাকে আদেশ করার মতো কোনো দেবতাও না।

জীয়ূস ॥ তাতে কী! আমাকে কি শাবাশ দিতে বলছ সেই তোমাকে যাকে একটা অসুস্থ ভেড়ার মতো পৃথক রাখতে হয়। কিংবা রাখতে হয় অন্তরীণ কোনো কুষ্ঠরোগীর মতো। অরেস্টিস, তুমি আমার ভেড়ার পালে ছিলে—অন্যান্য ভেড়ার সঙ্গে একই চারণভূমিতে ঘাস খেয়েছ। তোমার এই অহংসর্বস্ব স্বাধীনতা তোমাকে খোঁয়াড় থেকে পৃথক করছে। এর অর্থ কিন্তু নির্বাসন।

অরেস্টিস ॥ হ্যাঁ, তাই!

জীয়ূস ॥ কিন্তু রোগটার শুরু তো গতকাল। কাজেই এখনও পুরনো হয়ে গাঢ় হতে পারেনি। ফিরে এসো ঘরে। তোমার একাকীত্বের কথা ভাবো। তোমার ভগ্নীও তোমাকে পরিত্যাগ করছে। তোমার চোখ বেদনায় নীল, মুখ পাণ্ডুর। যে-রোগে তুমি ভুগছ তা মানবিক নয়—প্রকৃতিবহির্ভূত, তোমার চরিত্রবহির্ভূত! ফিরে এসো। আমি বিস্মরণ, আমিই শান্তি।

অরেস্টিস ॥ জানি তা আমার চরিত্রবহির্ভূত, প্রকৃতিবহির্ভূত, প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অজুহাতবিহীন, প্রতিকারবিহীন—কেবল আমার আমিতে যে প্রতিকার রয়েছে তা ছাড়া। কিন্তু আমি তোমার নিয়মের নিগড়ে ফিরে আসব না। আমার নিজের ছাড়া অন্য কোনো নিয়ম বিধিলিপি নয়। যে-প্রকৃতিকে তুমি মঙ্গল বলে জানো সে-প্রকৃতিতে আমি আর ফিরে আসব না, কারণ এর মধ্যে হাজারটা পথ আছে যার প্রত্যেকটাই তোমাতে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু আমাকে আমার নতুন পথে চলতেই হবে। কারণ হে জীয়ূস, আমি মানুষ, আর প্রত্যেক মানুষকেই তার নিজের পথ খুঁজে নিতে হয়। প্রকৃতি মানুষকে ঘৃণা করে, আর তুমিও হে দেবাধিরাজ মানুষকে ঘৃণা করো।

জীয়ূস ॥ সে-কথা অবশ্য সত্যি। মানুষ যখন তোমার মতো হয় তখন আমি তাকে ঘৃণাই করি।

অরেস্টিস ॥ হুশিয়ার। তুমি কিন্তু তোমার দুর্বলতাকেই স্বীকার করে নিচ্ছ। এই আমি কিন্তু তোমাকে ঘৃণা করি না। তোমার আমার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা একে অপরকে পাশ কাটিয়ে যাব দুটি

জাহাজের মতো—একে অন্যকে স্পর্শ না করে। তুমি দেবতা, কিন্তু আমি মুক্ত। তুমিও একাকী, আমিও একাকী—আমাদের যন্ত্রণার স্বরূপ এক। তুমি কী করে জানবে আমি ঐ ভয়াল দীর্ঘরাত্রিতে অনুশোচনায় দগ্ধ হইনি। কী করে জানবে আমি ঘুমুতে চাইনি। কিন্তু এখন আর অনুশোচনা নেই—ঘুমও নেই। *[নীরবতা]*

জীয়ূস ॥ তা, কী করবে ঠিক করেছ।

অরেস্টিস ॥ আরগোসের অধিবাসীরা আমার পরমাত্মীয়। আমি তাদের চোখ খুলে দেব।

জীয়ূস ॥ বেচারারা! তোমার সে উপহার হবে বড় বিষণ্ন—একাকীত্বের আর লজ্জার। ওদের চোখে আমি যে-আবরণটুকু রেখেছিলাম তা তুমি নির্মম হাতে ছিঁড়ে ফেলবে—আর ওরা নতুন দৃষ্টিতে ওদের জীবনকে দেখবে অর্থহীন বন্ধ্যা উপঢৌকনরূপে।

অরেস্টিস ॥ আমার মধ্যে এই হতাশাকে ওদের মাঝে ছড়িয়ে দেব না কেন? এই তো ওদের নিয়তি।

জীয়ূস ॥ তা নিয়ে ওরা কী করবে?

অরেস্টিস ॥ সে ওদের ইচ্ছে। ওরা মুক্ত। মানুষের জীবন তো শুরুই হয় হতাশার অন্য প্রান্তে।

জীয়ূস ॥ অরেস্টিস এর সবই আগে বলা ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল একজন মানুষ সময় হলে আসবে, এসে আমার পতন ঘোষণা করবে। আর তুমি সে-মানুষ। কিন্তু গতকাল তোমাকে দেখে, তোমার ঐ নরম রমণীসুলভ মুখখানি দেখে এ-কথা ভাবতেই পারিনি।

অরেস্টিস ॥ আমি নিজেই কি বিশ্বাস করতে পেরেছিলাম! আমি যে-শব্দগুলো উচ্চারণ করছি তার মাপ আমার মুখের চাইতে বড়—নিয়তির যে-বোঝা আমি

বইছি তা আমার যৌবনের চাইতে ভারী, আর তা আমাকে গুঁড়িয়ে ফেলেছে।

জীয়ূস ॥ তোমার জন্যে আমার কোনো ভালোবাসা নেই—তাহলেও তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে।

অরেস্টিস ॥ আমারও দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্য।

জীয়ূস ॥ বিদায় অরেস্টিস! *[দু পা এগিয়ে]* আর তুমি ইলেকট্রা এ-কথা মনে রেখো, আমার রাজত্ব এখনো শেষ হয়ে যায়নি! সংগ্রাম চলবেই—সুতরাং তুমি ভেবে দেখো তুমি কোন্ দিকে থাকবে! বিদায়।

*[জীয়ূসের প্রস্থান]*

## তৃতীয় দৃশ্য

[একই দৃশ্য]

অরেস্টিস ॥ কোথায় যাচ্ছ!

ইলেকট্রা ॥ আমায় যেতে দাও। তোমাকে আমার কিছুই বলার নেই।

অরেস্টিস ॥ মাত্র গতকাল তোমার দেখা পেলাম। আজই তোমাকে চিরতরে হারাতে হবে।

ইলেকট্রা ॥ তোমার সাথে আমার দেখা না হলেই ভালো হত।

অরেস্টিস ॥ ইলেকট্রা, বোন আমার, মানিক আমার। আমার জীবনের পরম স্নেহ, পরম দুঃখ, আমায় একা ফেলে যেও না, থাকো আমার সঙ্গে।

ইলেকট্রা ॥ চোর! আমার নিজের বলতে কীই বা ছিল—একটুকরো স্বপ্ন, একটুখানি শান্তি। তাও তুমি চুরি করে নিলে। একজন ভিক্ষুকের ঘসা

পয়সাটিকে পর্যন্ত নিয়ে নিলে। তুমি ছিলে আমার ভাই, আমাদের পরিবারের প্রধান, তোমার কর্তব্য ছিল আমাকে রক্ষা করা। কিন্তু আমাকে তোমার ঐ হত্যাযজ্ঞে না-টেনে আনলেই নয়। আমি এখন চামড়া-খসানো গরুর মতো—এই ঘৃণ্য মাছিগুলো আমাকে ঘিরে ধরেছে আর আমার হৃদয় এখন আন্দোলিত খোঁচা-খাওয়া মৌচাকের মতো।

অরেস্টিস ॥ লক্ষ্মী বোনটি আমার, হ্যাঁ এ-কথা সত্যি। তোমার সবই আমি নিয়েছি। আর প্রতিদানে তোমাকে দেবার মতোও আমার কিছু নেই—একমাত্র আমার অপরাধ ছাড়া। কিন্তু ভেবে দ্যাখো কী বিরাট উপহার সেটা। বিশ্বাস করো, আমার প্রাণে তা পাহাড়প্রমাণ বোঝা হয়ে চেপে আছে। আমরা ছিলাম খুবই হালকা, আর এখন আমাদের পা মাটিতে বসে যাচ্ছে ভিজা ঘাসে রথের চাকার মতো। সুতরাং এসো, আমার সঙ্গে এসো। আমরা ভারী পায়ে পথ চলব, বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। তুমি আমার হাত ধরবে, আমরা দুজনে যাব...

ইলেকট্রা ॥ কোথায়?

অরেস্টিস ॥ জানি না কোথায়। হয়তো আপন অন্তরের দিকে। ঐ নদী আর পাহাড়ের ওপারে যে অরেস্টিস আর ইলেকট্রা প্রতীক্ষা করছে—তাদের কাছেই যেতে হবে আমাদের পরম ধৈর্যের সাথে।

ইলেকট্রা ॥ তোমার আর-কোনো কথাই আমি শুনতে চাই না। আমাকে তোমার দুঃখ আর দারিদ্র্য ছাড়া কী দেবার আছে? *[স্টেজের মধ্যভাগের দিকে দৌড়ে যায়। প্রতিহিংসারা ওকে ঘিরে ধরে]* বাঁচাও, দেবতা জীয়ূস, দেবতা আর মানুষের রাজা

জীয়ূস, বাঁচাও আমাকে—আমাকে দু-বাহুতে টেনে নিয়ে এখান থেকে নিয়ে চলো। আশ্রয় দাও। তোমার নিয়ম আমি মানব। আমি তোমার চরণদাসী হব, তোমার পদসেবা করব। মাছির হাত থেকে, আমার ভাইয়ের কাছ থেকে, আমার নিজের কাছ থেকে, আমাকে রক্ষা করো। আমায় একা ফেলে যেও না, আমি সমস্ত জীবন সন্তাপে যাপন করব—আমি অনুতপ্ত, জীয়ূস—আমি ভীষণ অনুতপ্ত। *[দৌড়ে বেরিয়ে যায়]*

## চতুর্থ দৃশ্য

অরেস্টিস—প্রতিহিংসাদের সঙ্গে

[প্রতিহিংসারা ইলেকট্রার পিছু ধাওয়া করার জন্য পা বাড়াতেই প্রথম প্রতিহিংসা তাদের থামায়]

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ ভগিনীরা ওকে ছেড়ে দাও। ও আমাদের আওতার বাইরে চলে গেছে। কিন্তু ঐ যুবক আমাদের, আমাদের থাকবে বেশ কিছুকাল। তার দিল বড় শক্ত। সে দুজনের জন্যই যন্ত্রণা ভোগ করবে। *[ভনভন করতে করতে প্রতিহিংসারা অরেস্টিসের দিকে এগোয়]*

অরেস্টিস ॥ আমি বড্ড একা, বড্ড একা!

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ না, না, তা কেন হে আমার প্রিয় হন্তারক, আমি তোমার সাথে আছি। আর দ্যাখো কত মধুর খেলাই না দেখাব তোমার বিনোদনের জন্যে।

অরেস্টিস ॥ আমৃত্যু একা, একা। আর তারপর...?

প্রথম প্রতিহিংসা ॥ ভগিনীরা চাঙা হয়ে ওঠো। দ্যাখো, যুবক কেমন ভেঙে পড়ছে। চেয়ে দ্যাখো ওর চোখ কেমন

ঘুরছে। এখনই ওর সন্তপ্ত স্নায়ুগুলো বীণার তারের মতো কেমন কাঁপতে থাকবে।

দ্বিতীয় প্রতিহিংসা ॥ আর ক্ষুধায় কাতর সে শীঘ্রই এই আশ্রয় ছেড়ে বেরুবেই। আজ রাতের অন্ধকার ঘনাবার আগেই ওর রক্তের স্বাদ পাব আমরা।

অরেস্টিস ॥ বেচারি ইলেকট্রা!

*[গৃহশিক্ষকের প্রবেশ]*

## পঞ্চম দৃশ্য

অরেস্টিস, প্রতিহিংসা, গৃহশিক্ষক

গৃহশিক্ষক ॥ বাব্বা! প্রভু আপনি কোথায়। ওহ্ কী অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। আমি আপনার জন্য কিছু খাবার এনেছি। আরগোসের অধিবাসীরা মন্দির ঘিরে রয়েছে। এখান থেকে বেরুবার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করবেন না। আজ রাতে আমরা পালাবার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে চলুন কিছু খেয়ে নিন। *[প্রতিহিংসারা পথ রোধ করে দাঁড়ায়]* না! এরা কারা? এ যে দেখি কিংবদন্তির প্রাণী সব। হায় তিলোত্তমা গ্রিস; তুমি কত দূরে—দূরে তোমার অভ্রান্ত বিবেকবুদ্ধি!

অরেস্টিস ॥ আমার কাছে আসার চেষ্টা কোরো না। তাহলে ওরা তোমায় টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

গৃহশিক্ষক ॥ আস্তে সুন্দরীরা! দ্যাখো আমি কী এনেছি তোমাদের জন্য। চেয়ে দ্যাখো গোশ্‌ত আর ফলমূল। এই নাও। আশা করি এতেই তোমরা শান্ত হবে।

অরেস্টিস ॥ তাহলে আরগোসের অধিবাসীরা সব মন্দির ঘিরে রেখেছে!

গৃহশিক্ষক ॥ হ্যাঁ! আর ওদের মধ্যে কারা তোমার রক্ত পান করার জন্য বেশি উদগ্রীব তা বলা মুশকিল—এই সুন্দরীরা, নাকি বাইরের প্রজারা!

অরেস্টিস ॥ বেশ। *[কিছুক্ষণ নীরব থেকে]* দরজা খোলো!

গৃহশিক্ষক ॥ প্রভু আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে। দরজার বাইরে ওরা সবাই সশস্ত্র হয়ে অপেক্ষা করছে।

অরেস্টিস ॥ তোমাকে যা বলছি তাই করো।

গৃহশিক্ষক ॥ একবার হলেও আপনার আদেশ অমান্য করার অনুমতি দিন প্রভু। ওরা আপনাকে পাথর ছুড়ে মারবে। এ বদ্ধ পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।

অরেস্টিস ॥ বৃদ্ধ, আমি তোমার প্রভু। আর আমি তোমায় দরজা খুলে দেবার জন্য আদেশ করছি।

*[গৃহশিক্ষক দরজার একটি পাট ঈষৎ ফাঁক করে]*

গৃহশিক্ষক ॥ ওরে বাপরে!

অরেস্টিস ॥ দু-পাটই ভালো করে খোলো!

*[গৃহশিক্ষক দরজার এক পাট খুলে তার পেছনে আশ্রয় নেয়। জনতা হুড়মুড় করে দরজা খুলে এগোয়। তারপর হতভম্ব চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে। স্টেজে প্রচুর আলো।]*

## ষষ্ঠ দৃশ্য

একই দৃশ্য : জনতা

[জনতার মধ্যে বিকট ধ্বনি ওঠে। 'ওকে মারো', 'ওকে কাটো', 'টুকরো টুকরো করে ফ্যালো ওকে'।]

অরেস্টিস ॥ *[ওদের কথা কানে না নিয়ে]* সূর্য!

জনতা ॥ খুনি কসাই! বেদীন! তোমার শিরায় গরম সিসা ঢুকিয়ে দেব!

জনৈকা নারী ॥ আমি তোমার চোখদুটি খুবলে নেব!

অরেস্টিস ॥ *[উঠে দাঁড়িয়ে]* হে আমার অনুগত প্রজাগণ, তোমরা তাহলে এসেছ! আমি অরেস্টিস, তোমাদের রাজা। আগামেমননের পুত্র এবং আজই আমার অভিষেক!

*[জনতার মাঝে বিস্ময়, গুঞ্জন, অসন্তুষ্টি]*

আর চিৎকার কোরো না। *[জনতা সম্পূর্ণ নীরব হয়]* আমি জানি আমাকে তোমরা ভয় পাও। পনেরো বছর আগে আরেকজন নররক্তে দুহাত রাঙিয়ে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেদিন তোমরা তাকে ভয় পাওনি। তোমরা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলে সে তোমাদেরই লোক আর এমন কাজ করার মতো দুঃসাহস তার ছিল না। যে অপরাধ অপরাধী স্বীকার করে না তা হয় লাওয়ারিশ—কোনো মানুষের অপরাধ নয় সে তখন আর। সেভাবেই ব্যাপারটাকে দেখতে হবে তাই নয় কি? যেন অনেকটা দুর্ঘটনা, অপরাধ নয়। সুতরাং, তোমরা সেদিন একজন অপরাধীকে রাজা বলে বরণ করেছিলে—আর সে-অপরাধ অপরাধী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা প্রভুহারা কুকুরের মতো সারা শহরে ঘুরে বেড়াল। বুঝলে আরগোসের অধিবাসীরা, আমার অপরাধ একান্তই আমার। আমি একে আমার নিজের বলে দাবি করছি। এ আমার গৌরব, আমার জীবনের আরদ্ধ কাজ। আর তোমরা আমাকে না দিতে পারো শাস্তি, না করতে পারো করুণা। সেইজন্যই আমাকে দেখে তোমাদের ভয় লাগছে। কিন্তু তবু আমার দেশবাসী, আমি তোমাদের ভালোবাসি। আর তোমাদের জন্যই আমি হত্যা করেছি। তোমাদের

জন্যই আমি আমার রাজ্য দাবি করতে বাধ্য হয়েছি। অথচ তোমরা আমাকে চাওনি কারণ আমি তোমাদের আপনজন ছিলাম না। এখন আমি তোমাদের আপনজন—হে আমার প্রাণপ্রিয় প্রজারা, তোমাদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। আর তোমাদের রাজা হবার অধিকার আমি সযত্নে অর্জন করেছি। আর তোমাদের সমস্ত পাপ, অনুশোচনা, তোমাদের দুঃস্বপ্ন এবং ইজিসথাসের কৃতকর্ম—এ সবই আমার। আমি এ সবই আমার নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি। মৃতদের আর ভয় কোরো না। মৃতরা এখন আমার—আর চেয়ে দ্যাখো তোমাদের অনুগত মাছিরা তোমাদের পরিত্যাগ করেছে—ওরা এখন এসেছে আমার কাছে। কিন্তু ভয় পেয়ো না দেশবাসী আমার, আমি নিহত রাজার সিংহাসনে বসব না, কিংবা এই রক্তাপ্লুত হাতে ধারণ করব না ঐ রাজদণ্ড। দেবতা আমাকে ওটি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাকে 'না' বলেছি। আমি রাজ্যহীন এবং প্রজাহীন এক রাজা হতে চাই।

বিদায় হে আমার দেশবাসী, তোমাদের জীবনকে নতুনভাবে গড়বার চেষ্টা কোরো। এখানে সবই নূতন, সবই এখানে শুরু হবে নতুন করে। আমার জন্যও এক নতুন জীবন শুরু হচ্ছে, এক আশ্চর্য বিস্ময়কর জীবন।

এবার একটা গল্প শোনো। একবার গ্রীষ্মকালে স্কাইরেসে ইঁদুরের উপদ্রব শুরু হল। একটা বিচ্ছিরি রোগের মতো। ইঁদুরেরা সবকিছু খেয়ে ফেলে, নোংরা করে ফেলে। তাই শহরবাসীরা হয়ে পড়ল দিশেহারা। কিন্তু একদিন এক বংশীবাদক

এল শহরে। সে দাঁড়াল এসে শহরের বিপণিকেন্দ্রে। অনেকটা এইরকম করে *[অরেস্টিস উঠে দাঁড়ায়]* সে তাঁর বাঁশি বাজাতে শুরু করল আর সব ইঁদুর বেরিয়ে এসে ভিড় করল তার চারপাশে। তখন সে চলতে শুরু করল—এইরকম লম্বা লম্বা পা ফেলে *[অরেস্টিস বেদি থেকে নেমে আসে]* এবং সে স্কাইরেসের লোকদের ডেকে বলল—যাবার পথ করে দাও *[জনতা অরেস্টিসকে পথ করে দেয়]* এবং সব ইঁদুর তাদের মাথা তুলে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, এই মাছিরা যেমন এই মুহূর্তে দ্বিধাগ্রস্ত। দ্যাখো, দ্যাখো, মাছিদের দিকে তাকাও। তারপর হঠাৎ তারা তাঁর পিছু পিছু চলল এবং বংশীবাদক ইঁদুরের পালসহ চিরদিনের মতো চলে গেলেন। এই এমন করে...*[সে পা ফেলে আলোতে আসে। প্রতিহিংসারা চিৎকার করে তাঁর দিকে ধাবিত হয়]*

**সমাপ্ত**

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র

শ্রেষ্ঠ ফরাসী নাটক পর্বের অন্যতম নাটক।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র